বর্তমান মুসলিম দেশসমূহের শাসকবর্গ ও তাদের শাসন

(সংশয় নিরসন)

শায়খ আবু মুহাম্মদ আসেম আল-মাক্‌দিসী

وَمَا عَلَيْنَا إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ

'আর সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব'।(সূরা ইয়াসীন:১৭)

বর্তমান মুসলিম দেশসমূহের শাসকবর্গ ও তাদের শাসন

(সংশয় নিরসন)

মূল

শায়খ আবু মুহাম্মদ আসেম আল-মাক্‌দিসী

অনুবাদঃ ইবনে উসামা

সহযোগীতায় ঃ আসেম, নাসরুল্লাহ্ ও মুসআব

সম্পাদক : আবু বকর সিদ্দীক

সরলপথ পাবলিকেশন্স

পদ্মা টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

বর্তমান মুসলিম দেশসমূহের শাসকবর্গ ও তাদের শাসন

(সংশয় নিরসন)

মূল
শায়খ আবু মুহাম্মদ আসেম আল-মাক্দিসী

প্রকাশনায়ঃ সরলপথ পাবলিকেশন্স
প্রকাশকাল : নভেম্বর, ২০১১

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৭০ টাকা মাত্র

SOROLPOTH PUBLICATIONS
FIXD PRICE : 70.00 TK. 5 DOLAR (US).

অনুবাদকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যে। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাগণের উপর। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানবতার মুক্তির সনদ। আর ইসলামের মূল ভিত্তি হল একটি কালেমার উপর لا اله الا الله আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। এ কালিমাকে যে অন্তরে বিশ্বাস করবে, মুখে স্বীকার করবে, কাজে প্রকাশ করবে, সেই মুসলিম। সে যেমন স্বীকার করে ইবাদাত শুধু এক আল্লাহর জন্যে, তেমনি ভাবে তাকে এটাও স্বীকার করতে হবে , বিধান দানের ক্ষমতা শুধু তারই। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা মানা যেমন কুফর তেমনি কাউকে বিধানদাতা মানাও এর ব্যতিক্রম নয় ।

কিন্তু আক্ষেপ! শত আক্ষেপ!! এই সর্বগ্রাসী শিরক আজ পুরো মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করে নিয়েছে। মুসলিমরা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করে, কিন্তু বিধানদাতা মানে অন্যকে। চৌদ্দশ বছরের মধ্যে এ এক শতাব্দি যাতে পুরো বিশ্বে একটি রাষ্ট্রেও নেই ইসলামী হুকুমাত। অধিকাংশ মুসলিম জনগণই এ জঘন্য শিরকে লিপ্ত। এ করুন পরিস্থিতিতে কিছু আলেম এ ফিৎনার মুকাবেলায় দাড়িয়ে গেলেন এবং মানুষকে বুঝাতে লাগলেন, আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়ন করা কুফরী। কেউ যদি তা করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে, সুতরাং কাউকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা যাবে না। সকলের জন্যে অপরিহার্য এই জঘণ্য শিরক থেকে বেঁচে থাকা।

কিন্তু হক্ব যেখানে থাকবে বাতিল তো থাকবেই। এই আলেমদের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে গেল একদল দরবারী আলেম। আর এই শাসকদের পক্ষ নিয়ে বলতে লাগল এদের কুফর বড় কুফর নয় বরং ছোট কুফর, এরা অজ্ঞ, এরা কালিমা পাঠ করে ইত্যাদি। এ ধরনের আরো নানা সংশয় সৃষ্টি করতে লাগল, আজ পর্যন্ত যার ধারাবাহিকতা অব্যাহত।

যে সমস্ত আলেমে দ্বীন এই শিরকের ব্যাপারে সোচ্চার তাদের অন্যতম একজন হলেন আবু মুহাম্মাদ আসেম আল মাকদিসী (ফাক্কাল্লাহু আসরাহু)। যিনি এই শিরক বর্জনের দাওয়াত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং

দরবারী আলেম কর্তৃক রটানো সংশয়গুলো কোরআন ও হাদীস দ্বারা নিরসন করেছেন। আজ পর্যন্ত যিনি জর্ডান তাগুত সরকারের জিন্দান খানায় বন্দী। এই বিজ্ঞ আলেম কর্তৃক রচিত একটি কিতাব আমার হাতে আসে, বইটির নাম:

كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك و أنصار القوانين

(বিধানদাতাদের সাহায্যকারী ও মুশরিক সৈনিকদের পক্ষে বিতর্ককারী কর্তৃক সৃষ্ট সংশয় সমূহ নিরসন)। ভূমিকা পড়ে জানতে পারলাম বইটি কারাগারে বসে লেখা। পড়ে দেখলাম এর মধ্যে তাগুত্ব শাসক ও তাদের কুফরী শাসন সম্পর্কে প্রচলিত সকল সংশয়ের নিরসন কোরআন ও হাদীস দ্বারা সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে ।

আর বাংলা ভাষায় এধরনের একটি বইয়ের খুবই প্রয়োজনীয়তা ছিল। কেননা আমার জানামতে এবিষয়ে এত সুন্দর বই এর পূর্বে বাংলা ভাষায় লিখা হয়নি, সাথে সাথে ভাই আবু মুসাআব সহ আরো অনেকে বইটি অনুবাদের জন্যে পিড়াপিড়ি করছিল। ফলে আল্লাহ তাআলার নামে অনুবাদ শুরু করলাম। কাজটি যদিও সহজ ছিল না, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমার একান্ত মুখলিছ সাথীদের সহযোগীতায় অল্প কিছুদিনের মধ্যে অনুবাদের কাজ শেষ হল। যদি সাথীদের সহযোগীতা না হত তাহলে একার পক্ষে কাজটি শেষ করা কষ্টসাধ্য হত। তাই তাদেরকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাই। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

-ইবনে উসামা

সম্পাদকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁরই সাহায্য কামনা করি। তাঁরই কাছে ক্ষমা চাই। আমাদের নফ্সের সকল অনিষ্টতা এবং আমাদের সকল কর্মের ভুল ভ্রান্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁরই বান্দা এবং রাসূল।

আমরা মুসলিম। আমাদের দ্বীন ইসলাম। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের হাজারো মানুষের সাথে আমাদের বসবাস। আমাদের সমাজের মানুষেরা প্রতিদিনই হাজারো শিরক কুফরে লিপ্ত হচ্ছে নিজের অজান্তেই। এ যেন রাসূলের (সাঃ) ঐ কথার বাস্তবায়ন যে, এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ সকালে মুসলিম হবে; তো বিকালে হবে কাফের। আবার বিকালে মুসলিম হবে; তো সকালে হবে কাফের। মুসলিম হিসাবে এই সমাজের অজ্ঞ মানুষদের ইসলামের দাওয়া করা আমাদের অন্যতম ফরয দায়িত্ব। এই দাওয়ার কাজ করতে গিয়ে দেখলাম অনেকেই আজ এই দাওয়ার ময়দানে কাজ করছে। যারা আমাদের সমাজে কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক দাওয়ার কাজ করছেন তাদের অনেককেই দেখা যাচ্ছে শাসকদের বিধান রচনার কুফর; বড় কুফর না ছোট কুফর তা নিয়ে সংশয়ে আছেন।

অনেকেই তাগুত সরকারের পক্ষে সহীহ হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা মুসলিম প্রমাণ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। ভয়ের বিষয় হচ্ছে এই ভ্রান্তি কিন্তু আকীদায়। এ এমন এক ভ্রান্তি যার কারণে মানুষের ঈমান পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। 'তাওহীদ আল হাকেমিয়ার' মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অনেকেই বিদআত বলে পাশ কাটাতে চান। অনেকেই বলতে শুনেছি 'তাওহীদ আল হাকেমিয়্যাহ' নাকি খারেজীদের আবিষ্কার। আসলে যদি এটি বিদআত হয় তবে রুবুবিয়্যাহ সংক্রান্ত তাওহীদ, উলুহিয়্যাহ সংক্রান্ত তাওহীদ, আসমা ওয়াস সিফাহ সংক্রান্ত তাওহীদ সবগুলোই বিদআত হবে। এমন কি তাওহীদ পরিভাষাটিও। কেননা কুরআন ও হাদীসে এই পরিভাষাগুলোর ব্যবহৃত হয়নি। মূল কথা হচ্ছে, এইগুলোকে শাখা-প্রশাখা করে আল্লাহর এককত্ত্বকে

তখনই বুঝানো শুরু হয়েছে, যখন থেকে মানুষ বিভিন্ন ফেরকা বানিয়ে নানা ভাবে ইসলামি আক্বীদা পরিবর্তনের চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। আমাদের বর্তমান সমাজে প্রচলিত সবচেয়ে বড় কুফর হচ্ছে বিধান প্রণয়নের কুফর। আর এটাকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করার জন্যই আমরা 'তাওহীদ আল হাকেমিয়্যাহ' কে রুবুবিয়্যাহ সংক্রান্ত তাওহীদ, উলুহিয়্যাহ সংক্রান্ত তাওহীদ, আসমা ওয়াস সিফাহ সংক্রান্ত তাওহীদ থেকে আলাদা করে বুঝানোর চেষ্টা করি। মূলতঃ এই 'তাওহীদ আল হাকেমিয়্যাহ' ; রবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যাহ আর আসমা ওয়াস সিফাহরই অন্তর্ভূক্ত। এই বিষয়ে এখনো পর্যন্ত বাংলায় ভালো কোন লেখা না থাকায় আমরা কলম ধরার কাজটি শুরু করি। এমনই সময়ে আমার হাতে এসে পরে শায়খ মাকদিসীর এই বইটির আরবি কপি। সাথে সাথে আরবিতে পারদর্শী আমার সাথি ভাইদের বইটি দিয়ে অনুবাদ করতে অনুরোধ করি।
অনুবাদ শেষ হয়ে গেলে এই বইটির সম্পাদনার কাজ করার সুযোগ আমার মত অধমের কাছে এসে পরে। এই বইয়ের যেসব অংশ বুঝতে কঠিন হতে পারে, সে সকল অংশে আমরা টিকা লাগিয়ে অথবা ব্র্যাকেটের ভিতরে উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করেছি। ইনশাআল্লাহ পাঠকদের বুঝতে কষ্ট হবে না বলে আসা রাখি।

যতদূর সম্ভব সহজ ভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। আর মূল বইয়ের সকল হাদীস তাহক্বীক করে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। লেখায় কোন ভুল ত্রুটি হয়ে গেলে ক্ষমার চোখে দেখবেন বলে আসা রাখি। হে আল্লাহ আপনি আমাদের এই চেষ্টা কবুল করুন। আমাদের হক্ব ও বাতিলের পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করুন। তাগুত ও তাদের সহকারীদের ইসলাম বুঝার ও সকল কুফরি থেকে তওবাহ করে পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করার তাওফিক দিন। আমীন।

-আবু বকর সিদ্দীক

সূচীপত্র:

আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধান রচনা করা ও বিচারকগণের এই মানবরচিত আইন দ্বারা ফয়সালা করা একটি কুফরী কাজ

শাসকদের আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধান রচনা করা ও বিচারকগণের এই মানবরচিত আইন দ্বারা ফয়সালা করা একটি কুফরী কাজ। কিন্তু এই কুফর বড় কুফর না ছোট কুফর তা নিয়ে কিছু জ্ঞানপাপী দরবারী আলেম সংশয় সৃষ্টি করছে। এই সংশয়গুলোর সঠিক জবাব না জানার কারণে সাধারণ মুসলিমরা তো বিভ্রান্ত হচ্ছেই এমনকি অনেক দ্বায়ী ভাইদেরকেও বিভ্রান্তিতে ফেলে দিচ্ছে। এই সংশয়গুলো ও তার জবাব নিম্নে এক এক করে তুলে ধরা হল।

প্রথম সংশয়:

শাসকদের বিধান রচনার কুফর বড় কুফর[১] না ছোট কুফর[২]?

শাসকদের আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধান রচনা করা হচ্ছে একটি বড় কুফর। আমাদের সাথে দ্বিমত পোষণকারী কিছু লোক আছেন, যারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ণকারী তথাকথিত মুসলিম শাসকদের পক্ষাবলম্বন করে বলে থাকেন, "তোমরা যে মূলনীতির উপর ভিত্তি করে মুসলিম শাসকগণ এবং তাদের সাহায্যকারী সাংবাদিকদল, তাদের রক্ষাকারী সৈন্যদল ও তাদের পক্ষাবলম্বনকারী অন্যান্যদের কাফের বলে ঘোষণা দাও, সে মূলনীতিতে আমরা তোমাদের সাথে একমত নই। কেননা এই শাসকদের কুফরী আমাদের মতে ছোট কুফর। বড় কুফর (যা কোন ব্যক্তিকে ইসলামের

---

[১] বড় কুফর ঃ যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়, তার থেকে ইসলামের নিরাপত্তা বিধান উঠে যায়। যেমন: আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করা।

[২] ছোট কুফর ঃ এটা বড় কুফরের বিপরীত, অর্থাৎ তা কোন মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে না তবে তা অনেক অনেক বড় গুনাহ। যেমন: কোন নির্দোষ মুসলিম কে সেচ্ছায় হত্যা করা।

গন্ডি থেকে বের করে দেয়) নয়।" আর তাদের দাবি হচ্ছে, এ মতের প্রবক্তা ছিলেন কুরআনের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারী ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)।

আমাদের জবাব: দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে কিছু মানুষের মতানৈক্য থাকে। তবে তার একটি সীমারেখা আছে। যদি তা হয় শাখাগত বিষয়ে তবে তা মেনে নেয়া যায়। (উদাহরণস্বরূপ ৫ ওয়াক্ত সালাত যে ফরয এটি একটি মূল বিষয়। এতে মতভেদ হতে পারে না। কিন্তু সালাতের মধ্যে 'রফউল ইয়াদাইন' করা অথবা না করা এ নিয়ে মতভেদ থাকতেই পারে কারণ এটি শাখাগত বিষয়।) আলেমগণ বলেন, শাখাগত মাসআলায় মতানৈক্য সম্ভাব্য এবং স্বাভাবিক। কেননা অনেক ক্ষেত্রেই এ মতানৈক্য সৃষ্টি হয় কোন একটি হাদীস সহীহ বা যয়ীফ বলে রায় দেয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য থাকার কারণে। অথবা কোন হাদীস ফক্বীহ পর্যন্ত না পৌঁছার কারণে বা এ ধরণের অন্য কোন সমস্যা থাকার কারণে। আর যদি এ মতভেদ হয় দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে, তবে তা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। তারপরও কেউ মতানৈক্য তুলতে পারে; তবে তার অর্থ এই নয় যে, সত্যের সন্ধান না করেই অন্ধ ভাবে কোন এক মতের অনুসরণ করতে হবে। সত্য তো একটিই, একাধিক হতে পারে না। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন,

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

অর্থ: 'সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি অবশিষ্ট থাকে।' [সূরা ইউনুস: ৩২]

অপর স্থানে আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

অর্থ: 'এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত তবে তারা এর মধ্যে বহু অসঙ্গতি পেত।' [সূরা নিসা: ৮২]

সুতরাং দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে মতানৈক্য, বিশেষ করে তাওহীদ, রিসালাত, শিরক, ঈমান ও কুফরের মত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতানৈক্য কোন ভাবেই মেনে নেয়া যায় না। কোন ব্যক্তির জন্য এটি কোন ভাবেই বৈধ্য হবে না যে, এ ধরণের মতানৈক্যকে অজুহাত হিসেবে পেশ করে, এটিকে (মতানৈক্যকে) মুরতাদ ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন বা তাদের থেকে সাহায্য গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করবে। আর এ কাজটি যদি হয় সন্তুষ্টচিত্তে তবে তা হবে চূড়ান্ত পর্যায়ের অবৈধ। বরং অত্যাবশ্যক হলো যে

সকল মাসআলার উপর ঈমানের মূল ভিত্তি রয়েছে সেগুলোর মাঝে বিদ্যমান মতানৈক্যের সমাধান করা এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। কেননা আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

অর্থঃ 'তবে কি তোমরা মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে এমনিই সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না।' [সূরা মু'মিনুনঃ ১১৫]

আর তিনি কোন বিষয় কুরআন মাজিদে আলোচনা ব্যতিরেকে ছেড়ে দেননি। যেমন তিনি (সুবঃ) বলেছেন,

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

অর্থঃ- 'আমি কিতাবে কোন ত্রুটি রাখিনি।' [সূরা আনআমঃ ৩৮]

সুতরাং সকল কল্যাণকর বিষয়ে আল্লাহ (সুবঃ) আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং তাতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সকল মন্দ বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন এবং তা থেকে সতর্ক করেছেন।

বর্তমানকালের শাসকদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের দ্বারা তাদের কাফের হওয়া সুস্পষ্ট। আর কুফর হলো দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের একটি অন্যতম দিক। যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ও তাওহীদকে বুঝেছে তার নিকট এ সকল আল্লাহদ্রোহী শাসকদের কুফরের বিষয়টি দিবালোকের চেয়েও স্পষ্ট। কিন্তু এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই, যে ব্যক্তির চোখে পর্দা রয়েছে দ্বী-প্রহরের সূর্য্যও তার দৃষ্টিগোচর হবে না।

ইনশাআল্লাহ সামনে আমরা চেষ্টা করবো তাওহীদের পথ্য দ্বারা চোখের পর্দাকে সরিয়ে দিতে ও ঐশী আলো দ্বারা সকল আঁধার দূর করতে।

প্রথমত আমাদের জানা উচিৎ, এই সমস্ত আল্লাহদ্রোহী শাসকদের কে শুধুমাত্র একটি নীতির উপর ভিত্তি করে কাফের বলা হচ্ছে না। ফলে তাদেরকে ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর বাণী كفر دون كفر **'এই কুফর সেই পর্যায়ের কুফর নয়' এর অপব্যাখ্যা দ্বারা রক্ষা করা সম্ভব নয়। বরং তাদের এই কুফরী অনেকগুলো মূলনীতির উপর ভিত্তি করে সাব্যস্ত হয়েছে। যার প্রত্যেকটি তাদেরকে স্পষ্ট কাফের হিসেবে সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট। ঐ সকল কারণসমূহ থেকে শুধুমাত্র ছয়টি কারণ এখানে উল্লেখ করা হল।**

কুফরীর প্রথম কারণ:

কালিমার প্রথম দাবী 'তাগুতকে[৩] বর্জন' না করার কারণে তারা কাফের।

---

[৩] **ইমাম ইবনে জারীর তাবারী বলেন:** ঐ সকল আল্লাহদ্রোহী যারা আল্লাহর নাফরমানীতে সীমালংঘন করেছে এবং মানুষ যাদের আনুগত্য করে। সে মানুষ, জ্বীন, শয়তান, প্রতীমা, বা অন্য কিছুও হতে পারে।(তাফসীরে তাবারী : ৩/২১)
ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন: আল্লাহ ছাড়া যাদের আনুগত্য করা হয় তারাই ত্বা-গুত। (মাজমুআতুল ফাতাওয়া : ২৮/২০০)
ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব: ত্বা-গুত হচ্ছে ঐ সকল মা'বুদ, লিডার, মুরুব্বী, আল্লাহর পরিবর্তে যাদের আনুগত্য করা হয় এবং তারা এতে সন্তুষ্ট। (মাজমুআতুত তাওহীদ : পৃ:৯)
ইমাম কুরতুবী (রহ:) বলেন: ত্বা-গুত হচ্ছে গণক, যাদুকর, শয়তান এবং পথভ্রষ্ট সকল নেতা। (আল জামে লি আহকামিল কুরআন : ৩/২৮২)
ইবনুল কাইয়্যিম বলেন: তাগুত হচ্ছে ঐ সকল মা'বুদ, লিডার, মুরুব্বী যাদের আনুগত্য করতে গিয়ে সীমালংঘন করা হয়। আল্লাহ এবং তার রাসূল কে বাদ দিয়ে যাদের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া হয় অথবা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হয়। অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়া আনুগত্য করা হয়। অথবা আল্লাহর আনুগত্য মনে করে যে সকল গাইরুল্লাহর ইবাদত করা হয়। এরাই হল পৃথিবীর বড় বড় তাগুত। তুমি যদি এই তাগুতগুলো এবং মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর তবে বেশীর ভাগ মানুষকেই পাবে, যারা আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে তাগুতের ইবাদত করে। আল্লাহ এবং তার রাসূলের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়ার পরিবর্তে তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা নিয়ে যায়। আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করার পরিবর্তে তাগুতের আনুগত্য করে। (এ'লামুল মুওয়াক্কীঈন : ১/৫০)
ইমাম আব্দুর রহমান বলেন: আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হয়, যারা বাতিলের দিকে আহ্বান করে এবং বাতিলকে সজ্জিত-মন্ডিত করে উপস্থাপন করে, আল্লাহর এবং তার রাসূলের আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার-ফয়সালা করার জন্য যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে। এমনিভাবে গণক, যাদুকর, মূর্তিপূজকদের নেতা যারা কবরপূজার দিকে মানুষকে আহ্বান করে, যারা মিথ্যা কেচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করে মাজারের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করে। এরা সকলই তাগুত। এদের লিডার হচ্ছে শয়তান। (আদদুরারুস সানিয়্যাহ : ২/১০৩)

তাওহীদের সাক্ষ্যপ্রদানের মূল ভিত্তি হল দুটি। যার একটি অপরটি ব্যতীত কোনই
কাজে আসে না। বরং তাওহীদের কালেমাকে মেনে নেয়া এবং তার সত্যায়নের জন্য উভয়টি একইসাথে থাকা অত্যাবশ্যক। তার একটি হচ্ছে সকল বাতিল ইলাহ তথা গাইরুল্লাহকে প্রত্যাখ্যান (لا الـــه) আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ তথা সত্যায়ন (الاالله) যেমনটি আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

অর্থ:- 'অতঃপর যে ব্যক্তি তাগুত কে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, সে এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল।' [সূরা বাক্বারাঃ ২৫৬]

উক্ত আয়াতে الكفر بالطاغوت 'তাগুতকে অস্বীকার' থেকে প্রথম ভিত্তি لا الـــه এবং الايمان بـــالله 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস' থেকে দ্বিতীয় ভিত্তি الاالله এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল।

অতএব, যে ব্যক্তির মাঝে এই দুইটি ভিত্তির সমন্বয় ঘটল না, সে শক্ত হাতলকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরল না। ফলে সে হবে মুওয়াহ্‌হিদদের কাতার বহির্ভূত এক ব্যক্তি। আমরা যদি তাদের (দরবারী আলেমদের) দাবি মেনে নেই যে, এ সমস্ত শাসকবর্গ (যারা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে বিধানদাতা হিসেবে অংশীদার সাব্যস্ত করে এমনকি কখনও কখনও তারা নিজেরাও আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের বিরোধী বিধান রচনা করে তাগুতে পরিণত হয়।) যদিও তারা তাওহীদের দ্বিতীয় ভিত্তি الايمان بالله (আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস) আনয়ন করেছে তাও তারা আল্লাহর এককত্বে বিশ্বাসীদের কাতারে শামিল

মুহাম্মাদ হামেদ আল-ফক্বী বলেনঃ আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদত করা হতে যারা মানুষকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হয় (চাই সে জ্বিন, মানুষ, গাছ, পাথর যাই হোক না কেন)। এমনিভাবে যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে বাদ দিয়ে মনগড়া আইনে হুদদ, কেসাস, যিনা-ব্যভিচার, মদ এবং সুদ ইত্যাদির বিচার-ফয়সালা করে। (হাশিয়া ফতহুল মুজিদ : পৃঃ ২৮২)

হতে পারবে না। কেননা অপর একটি আবশ্যকীয় ভিত্তি এখনো **বাকি রয়ে** গেছে তা হল الكفربالطــاغوت 'তাগুতকে অস্বীকার'। আর আল্লাহ **(সুবঃ)** الايمان بالله 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস' এ রুকনের পূর্বে তা উল্লেখ করেছেন।

الكفربالطاغوت 'তাগুতকে অস্বীকার' করা ব্যতীত الايمان بـــالله 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস' তৎকালীন মক্কার কাফের কুরাইশদের ঈমানের মতই। কেননা মক্কার কাফের কুরাইশরা আল্লাহ (সুবঃ) এর প্রতি বিশ্বাস রাখত কিন্তু তাগুতকে বর্জন করত না। (তারা আল্লাহকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল ঠিকই কিন্তু আল্লাহর ইবাদাতের পাশাপাশি তারা মূর্তিরও ইবাদাত করত। মোটকথা তারা একমাত্র ইলাহ হিসাবে আল্লাহকে মেনে নেয় নি। তারা আল্লাহর বিধানসমূহকে নিজেদের জন্য গ্রহণ করে নি। তারা আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য/ইতাআত করেনি।) আর এটি জানা কথা, এই ঈমান মক্কার কাফের কুরাইশদের কোন কাজে আসেনি। তাদের জান-মালকে রক্ষা করতে পারেনি। বরং আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে শর্তযুক্ত ছিল তাগুতকে অস্বীকার করা, তাগুতের সাথে সকল সম্পর্কচ্ছেদ করা। এর পূর্বে শিরক মিশ্রিত ভেজাল ঈমান তাদের পার্থিব জগতের এবং পরকালের কোন বিধানের ব্যাপারে সামান্যতম উপকারেও আসেনি। আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

'তাদের অধিকাংশ আল্লাহ কে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও মুশরিক।' [সূরা ইউসুফঃ ১০৬]

আর শিরক হল ঈমানকে নষ্টকারী এবং নেক আমল ধ্বংসকারী।

আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থঃ 'যদি তুমি শিরক কর তাহলে তোমার সকল কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।' [সূরা যুমারঃ ৬৫]

সকলের জানা আছে এসমস্ত শাসকেরা পাশ্চাত্যের তাগুতদেরকে (ব্রিটিশ সরকার, আমেরিকান সরকার, কানাডিয়ান সরকার ইত্যাদি যারা ইসলামী আইন বাস্তবায়নকারী এবং বাস্তবায়নকামী জনতার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত।) এবং প্রাচ্যের তাগুতদেরকে (ভারত সরকার, চীন সরকার, জাপান সরকার ইত্যাদি।) অস্বীকার করে না। তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে না। বরং এরা

তাদেরই আস্থাভাজন ও তাদেরকেই ভালবাসে এবং ঝগড়া-বিবাদে তাদের নিকট মামলা দায়ের করে। তাদের রাষ্ট্রীয় নিয়ম অর্থাৎ কুফরী বিধান সমূহকে পছন্দ করে। তাদের সৃষ্ট আন্তর্জাতিক কুফরী সংস্থা (ট.ঘ.) জাতিসংঘের অপবিত্র ছায়ায় আশ্রয় নেয়।

এভাবে আরবী (এরাবিয়ান তথা আরবে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী শাসকেরা যারা কাফেরদের কাছে আল্লাহর এককত্বে বিশ্বাসী মুসলিমদের এবং ইসলামী খিলাফতকামী মুসলিমদের তুলে দেয় কঠোর নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করার জন্য।) তাগুতরা এবং তাদের নীতি সমূহ আন্তর্জাতিক কুফরী সংস্থা জাতিসংঘের নীতির মতই। আর এরা, এ সকল তাগুতদেরকেই ভালবাসে এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। আর তাদের এমন গোলামে পরিণত হয়েছে যে, কোন বিষয়েই মনিবের অবাধ্য হয় না এবং শিরক, কুফর সকল কাজেই মনিবের শক্তি জোগায়। চোখে পর্দা থাকার কারণে কারো কারো নিকট এই সমস্ত শাসকদের তাগুত হওয়ার বিষয়টি যদিও সংশয়যুক্ত কিন্তু প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য কাফেরদের তাগুত হওয়ার ব্যাপারে কারো সামান্যতম সংশয় নেই। (কাউকে যদি আল্লাহ অন্ধ করে দেন তাহলে ভিন্ন কথা।) এ সত্ত্বেও তাদেরকে বর্জন করাতো দূরের কথা বরং এ শাসকরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করতে সদা সচেষ্ট। এমনকি তাদের সাথে জাতিসংঘ নামের কুফরী সংঘ চুক্তিতেও আবদ্ধ। ফলে কোন সমস্যা দেখা দিলে এরা জাতিসংঘের কুফরী আদালতে মামলা দায়ের করে।

অতএব তারা তাওহীদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি الكفربالطـاغوت। (তাগুতকে অস্বীকার) পূর্ণ করেনি। সুতরাং কিভাবে তারা মুসলমান হতে পারে? তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেয়া হয়, তারা তাওহীদের দ্বিতীয় ভিত্তি الايمـان بـالله (আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস) পূর্ণ করেছে। কিন্তু অপরদিকে তারা নিজেরাই তাগুত সেজে বসে আছে। ফলে আল্লাহকে ব্যতিরেকে তাদের ইবাদাত করা হচ্ছে। কারণ তারা মানুষের জন্য এমন সব আইন প্রণয়ণ করছে যার অধিকার আল্লাহ (সুবঃ) কোন মাখলুককে দেননি। উপরন্তু তারা মানুষদেরকে সেদিকে আহ্বানও করছে এবং তাদের সংবিধান মানতে বাধ্য করছে। (যার আলোচনা ইনশাআল্লাহ সামনে আসছে।)

কুফরীর দ্বিতীয় কারণ:

আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন এবং শরীয়াত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার কারণে তারা কাফের।

তারা আল্লাহর দ্বীন এবং শরীয়াত নিয়ে বিদ্রুপকারীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে তারা (বিদ্রুপকারীরা) পত্রিকা, রেডিও, টি.ভি. এবং অন্যান্য স্বাধীন সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রকাশ্য এবং আকার ইঙ্গিতে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছে। আর এ কুলাঙ্গার শাসকবর্গরা এ মাধ্যমগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করছে (আমরা প্রায়ই দেখতে পাই সমাজে যারা রাসূল (সাঃ) কে নিয়ে ঠাট্টা করে, ইসলাম নিয়ে মসকরা করে তাদেরকে শাসকবর্গরা নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন)। সাথে সাথে তাদের স্ব-রচিত আইন এবং সেনাবাহিনী দ্বারা এদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এ নাস্তিক মুরতাদদের আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে দিচ্ছে।

আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (٦٦)

অর্থ: 'বল! তোমরা কি এক আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত ও তার রাসূলকে নিয়ে বিদ্রুপ করছিলে? অজুহাত দেখিওনা তোমরা ঈমান আনার পরে কুফরী করেছ।' [সূরা তাওবা: ৬৫,৬৬]

এই আয়াতগুলো ঐসকল লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যারা ছিল মুসলিম। তারা সালাত আদায় করতো, সিয়াম পালন করতো ও যাকাত দিত এমনকি তারা মুসলিমদের সাথে এক বড় জিহাদেও অংশগ্রহণ করেছিল। ইহা সত্ত্বেও যখন তারা কুরআন পাঠকারী সাহাবীদের ব্যাপারে উপহাস মূলক কথা বলল, তখন আল্লাহ (সুবঃ) তাদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করলেন:

قال الزبير : وهو الذي شهد عليه الزبير بهذا الكلام و وديعة بن ثابت بن عمرو بن عوف وهو الذي قال : إنما كنا نخوض ونلعب وهو الذي قال : مالي أرى قرآنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء

যুবায়ের (রাঃ) বলেন, আর তিনি একথা বলার সময় উপস্থিত ছিলেন, ওদিয়া ইবনে ছাবেত বিন আমর বলল, আমরা শুধুমাত্র তোমাদের সাথে হাসি ঠাট্টা

করছি এবং সে আরো বলল, হায়! কি হল যে, এই কোরআন পাঠকারীরা দেখি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খাদ্যের প্রতি বেশী উৎসাহী, আর শত্রুর মোকাবেলায় সবচেয়ে বেশী ভীরু।
[তাবারানীর মুজামুল কাবীর :৩০১৭; প্রত্যেক রাবী আলাদা আলাদা ভাবে সিকাহ, তবে সনদটি গারীব। মোটকথা হাদীসটি হাসান স্তরের তাই গ্রহণযোগ্য।]
তাহলে ঐ সমস্ত লোকের ব্যাপারে চিন্তা করুন যাদের অন্তরে আল্লাহর বিধানের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধ নেই বরং তাকে হাসি-তামাসার বস্তুরূপে গ্রহণ করেছে। নিজেদের পিছনে অবহেলা ভরে ছুঁড়ে মেরেছে। আর সবচেয়ে ভয়ানক বিষয় হলো তারা আল্লাহর কুরআনকে তথা কুরআনের বিধি-বিধানকে তাদের স্বহস্তে রচিত আইন-কানুনের নিচে অবস্থান দিয়েছে। কুরআনের আদেশ ও নিষেধ সমূহকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ইয়াহুদী-খৃষ্টান ও নাস্তিকদের সাথে সলাপরামর্শ করে রদ করছে (তারা বলে কুরআনের বিধান গুলো নাকি মানবতাবিরোধী ও বর্বর)। কিতাবুল্লাহ এর সাথে এর চেয়ে বড় উপহাস ও ঠাট্টা আর কী হতে পারে?

কুফরীর তৃতীয় কারণ:

তারা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখার কারণে এবং বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করার কারণে কাফের।

এই সমস্ত শাসকরা কাফেরদের সাথে পারস্পারিক সাহায্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এবং মুওয়াহ্হীদ (আল্লাহর এককত্বে বিশ্বাসী) মুসলমানদের কে জঙ্গী ও চরমপন্থী আখ্যা দিয়ে উক্ত চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সংবাদ কাফেরদের সাথে আদান-প্রদান করে এবং মুসলিম মুজাহিদদের গ্রেফতার করে তাগুত সরকারদের হাতে অর্পণ করে। আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

অর্থঃ 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে।' [সূরা মায়িদা: ৫১]

একারণেই শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব نواقض الاسلام (নাওয়াক্বিযুল ইসলাম) নামক গ্রন্থে বলেন, ঈমান নষ্ট হওয়ার ৮নং কারণ হলো মুশরিকদের সাহায্য সহযোগিতা করা।

তার দৌহিত্র সুলাইমান বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব তার حكم موالاة اهل الاشـــتراك (হুকমু মুওয়ালাতি আহলিল ইশতিরাক) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

অর্থ:- 'তুমি কি মুনাফিকদেরকে দেখোনি যারা আহলে কিতাবের মধ্য হতে তাদের কাফির ভাইদেরকে বলে, 'তোমাদেরকে বের করে দেয়া হলে আমরাও তোমাদের সাথে অবশ্যই বেরিয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনোই কারো আনুগত্য করব না। আর তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আর আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা মিথ্যাবাদী।' [সূরা হাশর: ১১]

এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে, এমন কিছু মানুষের ব্যাপারে, যারা বাহ্যিক ভাবে ইসলামকে প্রকাশ করত। একজন ব্যক্তি মুসলিম কি কাফের তার প্রমাণসরূপ তাদের বাহ্যিক প্রকাশকেই গ্রহণ করা হত। কেননা মুসলমানদের প্রতি হুকুম ছিল বাহ্যিকতার বিচার করার। কিন্তু যখন তারা সাহাবীগণের বিরুদ্ধে ইয়াহুদীদের সাহায্য করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হলো (যদিও আল্লাহ (সুবঃ) জানতেন তাদের চুক্তিতে তারা মিথ্যাবাদী) তখন আল্লাহ (সুবঃ) ইয়াহুদীদেরকে তাদের ভাই বলে আখ্যা দিলেন। আর এ চুক্তিই ছিল তাদের কুফরীর কারণ। [হুকমু মুওয়ালাতি আহলিল ইশতিরাক]

অতএব ঐসমস্ত শাসকদের পরিণতি আরো কত করুণ, যারা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের আইন প্রণয়ণকারী মুশরিকদের সাথে পরস্পর সাহায্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং তাওহীদে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ও তাদেরকে আপন মনিবদের (আমেরিকা, ব্রিটেন ও অন্যান্য কাফের রাষ্ট্রের সরকারের) হাতে অর্পণ করে। কোন সন্দেহ নেই, অবশ্যই তারা এই হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবে।

কুফরীর চতুর্থ কারণ:

আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে গণতন্ত্রকে দ্বীনরূপে গ্রহণ করার কারণে তারা কাফের।

আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন কেবল ইসলামই'। [সূরা আল ইমরান: ১৯] ইসলাম হল আল্লাহর দ্বীনে হক্ব, যা দিয়ে তিনি মুহাম্মদ (সাঃ) কে প্রেরণ করেছেন। আর গণতন্ত্রের প্রবর্তক হল গ্রীকরা। নিঃসন্দেহে না এটা আল্লাহ প্রদত্ত, না সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

'সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কী থাকে'। [সূরা ইউনুস: ৩২] আর এসকল লোকেরা সর্বদাই প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করছে যে, তাদের একমাত্র পছন্দ ও গর্বের বিষয় গণতন্ত্র, ইসলাম নয়।

গণতন্ত্র ও ইসলাম এ দুটি পরিপূর্ণ ভিন্ন বিষয়। দুটিকে একত্র করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আল্লাহ (সুবঃ) একমাত্র খালেছ ইসলামকেই কবুল করবেন। আর ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

'বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।'[সূরা আনআম:৫৭,সূরা ইউসুফ:৪০]

আর গণতন্ত্র হল একটি শিরক ও কুফর মিশ্রিত জীবন বিধান। যা আল্লাহ কে বাদ দিয়ে বিধি-বিধান এবং আইন প্রণয়নকারী জনগণকে সাব্যস্ত করে।[যেমন বাংলাদেশ সংবিধান ৭/ক ধারা হল 'সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ' বা 'সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ'।] আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন মানুষের আ'মাল কখনোই গ্রহণ করবেন না এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না যে কুফরকে গ্রহণ করে আবার ইসলামেরও দাবী করে, শিরকও করে আবার তাওহীদেরও বুলি আওড়ায়। বরং কোন ব্যক্তির ইসলাম ও তাওহীদ ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সঠিক বলে গণ্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে সত্যনিষ্ঠ দ্বীন ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল দ্বীনকে অস্বীকার না করে

এবং সকল শিরক ও কুফর থেকে মুক্ত না হয়। কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছেঃ

إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٣٧) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ (٣٨)

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আমি পরিত্যাগ করেছি সে কওমের ধর্ম যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না এবং যারা আখিরাতকে অস্বীকারকারী। 'আর আমি অনুসরণ করেছি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের ধর্ম। আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা আমাদের জন্য সঙ্গত নয়।' [সূরা ইউসুফ: ৩৭, ৩৮]

এবং সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

عَنْ أَبِى مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ . (صحيح مسلم)

অর্থ: 'আবি মালিক (রা.) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ বলল এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল উপাস্য কে অস্বীকার করল সে তার মাল সম্পদ, রক্ত এবং হিসাব কে আল্লাহর কাছ থেকে নিরাপদ করে নিল। [সহীহ মুসলিমঃ কিতাবুল ঈমানঃ ৩৭-(২৩)]

অন্য রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ 'যে আল্লাহকে এক বলে মেনে নিল' [সহীহ মুসলিমঃ কিতাবুল ঈমান: ৩৮-(২৩)]

দ্বীন বা জীবন বিধান বলতে শুধুমাত্র ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান ধর্মকে বুঝায় না বরং গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা এধরণের মানব রচিত যত জীবন বিধান আছে সব গুলোই এর অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং আবশ্যক হল এ ধরণের সকল মিথ্যা ধর্ম এবং বাতিল মতবাদ থেকে নিজেকে পবিত্র রাখতে হবে, যাতে আল্লাহ তার থেকে দ্বীন ইসলামকে কবুল করে।

যেমনিভাবে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে এই বৈধতা বা সম্ভবনা নেই, কোন মানুষ 'খৃষ্ট মুসলমান' বা 'ইয়াহুদী মুসলমান' হবে তেমনিভাবে আল্লাহ (সুবঃ) এটাও পছন্দ করেন না যে, কোন ব্যক্তি গণতন্ত্রী মুসলমান হবে। কেননা ইসলাম

হল আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন আর গণতন্ত্র হল একটি কুফরী মতবাদ। আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ:'আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চায়, তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[সূরা আল ইমরান:৮৫]

আর যদি কোন ব্যক্তি ইসলাম কে ছেড়ে দেয় এবং ইসলামের সীমারেখা, বিধি-বিধান অবজ্ঞা করে এবং গণতন্ত্রকে পছন্দ করে ও তার আইন-কানুন ও সীমারেখাকে গ্রহণ করে তাহলে তার অবস্থা কতই না শোচনীয়।

কুফরীর পঞ্চম কারণ:

তারা নিজেদেরকে এবং তাদের শাসকদেরকে আল্লাহর সমতুল্য সাব্যস্ত করার কারণে কাফের।

যে দ্বীনকে (জীবন বিধানকে)তারা নিজ দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছে এটাই তাদের নিকট আল্লাহর (সুবঃ) চেয়ে অধিক সম্মানি। তাইতো আল্লাহর বিধান সমূহকে পরিত্যাগ করেছে এবং তা দেয়ালের পিছনে ছুড়ে মেরেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের বিরোধীতা করে বা বিপক্ষে যায় এবং এর ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে ও যুদ্ধে অবস্থান নেয় সে-ই তাদের প্রিয় পাত্রে পরিণত হয়। তাকে নিজেদের আইন দ্বারা রক্ষা করে। সে মুরতাদ হওয়া সত্ত্বেও মানব অধিকার, বাক স্বাধীনতা ইত্যাদি মুখরোচক শেস্নাগান তুলে তার জন্যে সাফাই গাওয়া হয়।

আর যদি কেউ তাদের নিয়মের বিরোধীতা করে এবং তাদের বিধি-বিধান কে তিরস্কার করে। তাদের শাসকদের বিপক্ষে দাড়ায়, তাহলে হয়তো তাকে তাদের রোষানলে পতিত হয়ে জীবন হারাতে হয়। অথবা তাকে বন্দি করে রাখা হয়।

পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ (সুবঃ) এবং তার রাসূল (সাঃ) কে অথবা ইসলামকে গালি দেয়। অতঃপর যদি তাকে আদালতে নেওয়া হয় তাহলে তার বিচার হয় বে-সামরিক আদালতে এবং তার শাস্তি হয় দু-মাস। এর বিপরীতে কেউ যদি তাদের বানানো ইলাহ বা রব তথা প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী এবং

তাদের দোসরদের গালি দেয় তাহলে তার বিচার হয় উচ্চ আদালতে এবং কমপক্ষে তার শাস্তি হয় তিন বছর।

যদি আল্লাহ (সুবঃ) এর জন্য তাদের সামান্যতমও সম্মানবোধ থাকতো তাহলে তারা নিজেদেরকে এবং তাদের শাসকদেরকে আল্লাহর (সুবঃ) সমতুল্য করতনা। উপরন্তু তারা এর চেয়ে আগে বেড়ে তাদের রবদেরকে (শাসকদেরকে) আল্লাহর চেয়ে বেশী সম্মান করে। প্রথম যুগের মুশরিকরাও তাদের শরীকদের কে আল্লাহর ন্যায় ভালবাসত এবং তারা তাদের রবদেরকে (সমাজপতিদের) বিধান প্রণয়ন, সম্মান প্রদান ও ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সমতুল্য সাব্যস্ত করত। আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

অর্থঃ 'এবং মানুষের মাঝে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে এমনভাবে অংশীদার সাব্যস্ত করে যে, তাদেরকে তারা ভালবাসে আল্লাহকে ভালবাসার মত' ।[সূরা বাক্বারাঃ ১৬৫]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ

تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (৯৭) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (৯৮)

অর্থঃ 'আল্লাহর কসম! আমরাতো সেই সময় স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম। যখন আমরা তোমাদেরকে রাব্বুল আলামীনের সমকক্ষ মনে করতাম'। [সূরা শুআ'রাঃ ৯৭,৯৮]

আর আমাদের সময়ের মুশরিকরা তাদের চেয়ে অধিক ধৃষ্টতা দেখিয়েছে এবং তাদের রবদেরকে আল্লাহর উপর স্থান দিয়েছে। (তারা যা কিছু বলে আল্লাহ তাআলা তার অনেক উর্ধে)। তাদের আইন-কানুন এবং অবস্থা সম্পর্কে যার সামান্য অবগতি রয়েছে সে এ ব্যাপারে কোন আপত্তি তুলতে পারেনা।

সামনের আলোচনা থেকে পাঠকগণ বুঝতে পারবেন যে, তাদের নিকট প্রধান বিধানদাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নন, বরং তারা যাদের প্রণীত আইনের অনুসরণ করে সে সকল তাগুতই হল তাদের মূল ইলাহ। যাদেরকে তারা ভালবাসে এবং আল্লাহর চেয়ে বেশী সম্মান করে। যাদের জন্য এবং যাদের বিধি-বিধানের জন্য তারা লড়াই করে, প্রতিশোধ গ্রহণ করে এমনকি তা বাস্ত বায়নের জন্য সব ধরণের কষ্ট স্বীকারে সদা প্রস্তুত থাকে। যদি আল্লাহর দ্বীন ধ্বংস হয়ে যায় এবং তার শরীয়াতকে গালি দেওয়া হয় তাহলে তারা সামান্য প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করে না। (বর্তমান সময়ের বাস্তব চিত্রই যার বড় প্রমাণ)

কুফরীর ষষ্ঠ কারণ:

আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে বিধান রচনা করার কারণে তারা কাফের।

নিজেদের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়ন এটা বর্তমান সময়ের একটি সর্বগ্রাসী শিরক। যার প্রচলন ঘটিয়েছে এই কুলাঙ্গার শাসকবর্গ এবং মানুষদেরকে তার দিকে আহ্বান করছে। প্রতিনিয়ত এ কাজে সদস্য হতে এবং অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করছে। তারা তাদের সংবিধানে আল্লাহর তাওহীদ এবং সঠিক দ্বীনের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করছে। আর সংবিধান তাদেরকে সকল বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়ে থাকে। [বাংলাদেশের সংবিধানের ১ম অনুচ্ছেদে ৭ এর (ক) ধারায় উল্লেখ আছে "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে"।]

যেমন জর্ডানের সংবিধানের ২৬ এর (ক) ধারা হল:

السلطة التشريعية تناط بالملك واعظاء مجلس الامة

"আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বাদশা এবং জাতীয় পরিষদের সদস্যদের হাতে ন্যস্ত থাকবে।"

সংবিধানের ২৬ এর (খ) ধারায় আছে:

تمارس السلطة التشريعية صلاحيتهاوفقا لمواد الدستور

"আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা সংবিধানের মূলনীতি অনুযায়ী হবে।"

আল্লাহ (সুবঃ) মুশরিকদের ধিক্কার দিয়ে বর্ণনা করেছেন:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

অর্থ: 'তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি।' [সূরা শু'রা : ২১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

অর্থ: 'ভিন্ন ভিন্ন বহু রব শ্রেয়, নাকি ঐ এক আল্লাহ যার ক্ষমতা সর্বব্যাপী' [সূরা ইউসুফ: ৩৯]

আল্লাহ শুধু একটি মাসআলায় মুশরিকদের অনুসরণ করার ব্যাপারে বলেছেন:

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

'আর তোমরা যদি তাদের অনুসরণ কর তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা মুশরিকে পরিণত হবে' [সূরা আনআম: ১২১]

এ কথা স্পষ্ট যে, তারা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে বড় শিরক করেছে। জর্ডানের সংবিধানে উল্লেখ আছে:

ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي من مصادرالتشريع

'আইন প্রণয়নের উৎস সমূহ থেকে প্রধান উৎস হল ইসলামী শরীয়াত।'[৪]

অর্থাৎ তারা আইন প্রণয়নে আল্লাহর একক ক্ষমতায় বিশ্বাসী নয়। বরং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাদের ছোট বড় অনেক উৎস রয়েছে। আর ইসলামী শরীয়াত হল এ সমস্ত উৎসের একটি।

<u>সারকথা হল</u> : তাদের জন্য বিধানদানকারী অনেক প্রভূ রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে কেউ বা প্রধান আবার কেউ বা ছোট। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হলেন এসব প্রভুদের মধ্য থেকে একজন। (তারা যা মিথ্যা বলে আল্লাহ (সুবঃ) তার থেকে অনেক উর্ধ্বে)

এই শাসকদের বিধি-বিধান সম্পর্কে যিনি অবগত তিনি অবশ্যই জেনে থাকবেন, তাদের মধ্যে একজন প্রধান থাকে। যার অনুমোদন ব্যতীত কোন আইন পাশ হয় না বা বাতিল হয় না। এই তাগুত-ই হল তাদের প্রধান বিধানদাতা তথা রব। চাই সে কোন বাদশা হোক বা প্রধানমন্ত্রী হোক বা প্রেসিডেন্ট হোক অথবা হোক কোন আমীর।

<u>যদি আসমানে অবস্থিত মহান রবের বিধান থেকে কোন কিছুর প্রস্তাব পেশ করা হয়, তাহলে তাদের মনোনীত পৃথিবীর এই মিথ্যা রবের সন্তুষ্টি এবং</u>

---

[৪] আর বাংলাদেশের সংবিধানের ১ম অনুচ্ছেদে ৭ এর (খ) ধারায় উল্লেখ আছে, "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।" (সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ সংবিধানে আইনের প্রধান উৎস হিসাবে তো দূরের কথা, শাখা উৎস হিসাবে ইসলামী শরীয়াত নেই।)

অনুমোদন ব্যতীত তা বাস্তবায়ন হয় না। যদি সে অনুমোদন না করে তাহলে তা বতিল বলে গণ্য হয়।

আর এদের কুফর কুরাইশ কুফ্ফারদের কুফরের চেয়েও জঘন্যতম। কেননা তারা আল্লাহর সাথে একাধিক 'ইলাহ' এবং বহু রবের শরীক করতো, আর এ শিরক ছিল শুধু ইবাদাত তথা রুকু, সিজদার মাঝে সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে এই তাগুতরা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে সকল বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে। যার দুঃসাহস তৎকালিন মুশরিকরাও দেখাতে পারেনি। ফলে এদের শিরক হল অত্যাধিক জঘন্য ও ঘৃণিত। কেননা কুরাইশের মুশরিকরা আল্লাহ (সুবঃ) কে তাদের সবচেয়ে বড় এবং মহান রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল। বরং তাদের বিশ্বাস ছিল তারা এ সমস্ত মূর্তির পূজা করে যাতে করে এরা তাদেরকে আসমানে অবস্থিত মহান রব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকটবর্তী করে দেয়।

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

'আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদাত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।'[সূরা যুমার: ৩]

তাদের কেউ কেউ আবার হজ্জের সময় তালবিয়া পাঠ করত:

لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ إِلاَّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ

অর্থ: 'হে আল্লাহ আমি উপস্থিত। তোমার কোন শরীক নেই কিন্তু একজন যার মালিক তুমি স্বয়ং এবং তার মালিকানাধীন সবকিছুর অধিকার তোমারই।' [সহীহ মুসলিম: কিতাবুল হাজ্জ: ২২-(১১৮৫)]

এই সমস্ত মুশরিকরা এ কথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ (সুবঃ) রিযিক দান করেন। তিনিই মৃতকে জীবিত করেন। তিনিই আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফসল উৎপন্ন করেন, সুস্থতা দান করেন। যাকে চান পুত্র সন্তান দান করেন আর যাকে চান কন্যা সন্তান। অথবা কাউকে উভয়টা দিয়ে থাকেন কিংবা কাউকে বন্ধ্যা বানান।

এগুলোর কোনটির ক্ষমতা তাদের বাদশা বা সরকারের নেই। কিন্তু বর্তমান শাসকদের সাহায্যকারী সাংবাদিক, সৈনিক সহ অন্যান্য সরকারী আমলাদের বিশ্বাস হলো আইন প্রণয়ন করা এবং বিধি-বিধান প্রবর্তনের ক্ষমতা তাদের এই সমস্ত শাসক বা রবদের আছে। আর এই তাগুত গুলোই হল তাদের জমিনের ইলাহ। এরা শিরকের ক্ষেত্রে কুরাইশ কুফ্ফারদের মতই। কিন্তু এরা

এইসব ইলাহদের আদেশ নিষেধ এবং আইন কানুনকে আল্লাহর বিধি-বিধানের চেয়ে বেশী সম্মান করে থাকে। সুতরাং ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস যে আবু জাহেল এবং আবু লাহাবের চেয়েও নিকৃষ্টতম কাফের।

জেনে রাখা উচিৎ! এই সমস্ত লোকদের কুফর এবং শিরকের আরো অনেক কারণ রয়েছে। আমরা যদি সবগুলি এখানে উল্লেখ করি তাহলে লেখা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।

কুফরীর প্রায় সকল কারণ তাদের মধ্যে বিদ্যমান। বরং এই ক্ষেত্রে তারা অনেক আগে বেড়েছে। কিন্তু যা আলোচনা হলো তা-ই সত্য সন্ধানীর জন্য যথেষ্ট। তবে আল্লাহ (সুবঃ) যদি কারো অন্তরে মহর অংকিত করে দেন আর তার সামনে পাহাড় সমান প্রমাণ পেশ করা হয় তাহলে সেটা তার কোন কাজে আসবে না। তথাপি সে সত্য অনুসন্ধান করবে না।

এই অধ্যায়গুলোতে আমরা যা বুঝাতে চেয়েছি তা হলো এই সমস্ত লোকদের কুফরী শুধুমাত্র এক কারণে নয় যা কোন ব্যক্তি বিশেষের উক্তি বা সংশয়কে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে। বরং তারা শিরক ও কুফরের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত।

তাদের যুক্তি খন্ডন:

ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর মতের সঠিক ব্যাখ্যা:

আলী (রাঃ) এবং মুওয়াবিয়া (রাঃ) এর মধ্যে মতপার্থক্য এবং ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য উভয় পক্ষ থেকে একজন করে সালিস নির্ধারণ করা হল। তখন খারেজীরা ক্ষেপে উঠলো এবং বলতে লাগল حكمتم الرجال 'তোমরা মানুষদেরকে বিচারের ভার দিয়েছো' অতঃপর এই আয়াত পাঠ করতে লাগল

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করে না তারা কাফের।" তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, كفر دون كفر 'এটা সে পর্যায়ের কুফর নয়'।

আমাদের এই অধ্যায়গুলোতে সবচেয়ে বেশী অনুধাবন করার বিষয় হল আমরা এখানে যে শিরক ও কুফরের কথা বলেছি, তা হলো আল্লাহর আইনের পরিবর্তে নিজের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়ন করা এবং সে আইনেই বিচার

পরিচালনা করা। আমাদের কথার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের অনুসারী কোন মুসলিম শাসক কোন বিচার কার্যে ইসলামী শরীয়তের সঠিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন শিথিলতা করে ফেললে সে সাথে সাথে কাফের হয়ে যাবে। (বিষয়টি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা জরুরী)

আর ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে যে উক্তিটি (كفر دون كفر) বর্ণিত আছে বলে উল্লেখ করা হয়, [৫] তার সম্পর্ক হল এই দ্বিতীয় পর্যায়ের শাসকদের সাথে। আর প্রথম পর্যায়ের শাসকদের (যাদের শিরকের আলোচনা পূর্বে সবিস্তারে উদ্ধৃত হয়েছে) বিষয়ে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সাথে খারেজীদের কোনই মতানৈক্য হয়নি। কেননা সে জামানায় মুসলমানদের এমন একজন শাসকও ছিলেন না যিনি আল্লাহর সাথে সাথে নিজেকেও আইন প্রণয়নের অধিকারী হিসেবে দাবি করার মত দুঃসাহস দেখাতে পারেন। অথবা কোন একটি বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে কোন বিধান প্রণয়নের কথা ভাবতে পারেন। কেননা এটা তাদের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে বড় কুফর ছিল (যা কোন মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়)।

আর ইবনে আব্বাস (রাঃ);

---

[৫] মুসতাদরাকে হাকেম এর বর্ণনাটিতে আল হাকিম বর্ণনা করেন, আলী বিন হারব থেকে , তিনি সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ থেকে, তিনি হিশাম বিন হুজাইর থেকে, তিনি তাউস থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনে অব্বাস বলেছেন, 'এটা ঐ কুফর নয় যেদিকে তোমরা ঝুকে পড়ছ (বুঝাতে চাচ্ছ), "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারা কাফির" হচ্ছে ছোট কুফর বড় কুফর নয় [কুফর দুনা কুফর]'। [আলমুস্তাদরাকে হাকেম, ভলিয়ম :২, পৃ:৩১৩]
হাদীসটির বিশুদ্ধতা ঃ যদিও আল হাকেম উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন; কিন্তু সত্যতা হল এই যে, ইমাম আহমাদ, ইয়াহইয়া ইবনে হুযাইর এবং আরও অনেকে হিশাম ইবনে হুযাইরকে 'যাঈফ' বলেছেন (দেখুন তাহযীব আত তাহযীব, খন্ড:৬/২৫)। ইবনে আদিও তাকে 'যাঈফ' বণর্নাকারীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এবং আল উকাইলীও একই কথা বলেছেন (আয যুআফা আল কাবীর ,খন্ড ৪/২৩৮)। সুতরাং এই হাদীসটিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যাবে না এবং এই একই রাবী হিশাম বিন হুযাঈর এর কারণেই প্রায় একই হাদীসের আরেকটি বণর্না যা ইবনে কাসীর উল্লেখ করেছেন (তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খন্ড ২/৬২) সেটিও 'যাঈফ' এবং দলীল হিসাবে অগ্রহণযোগ্য।

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

'আর তোমরা যদি তাদের অনুসরণ কর তাহলে নিশ্চয় তোমরা মুশরিকে পরিণত হবে'। [সূরা আনআমঃ ১২১] এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ উল্লেখ করে বলেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কোন একটি বিধানে মুশরিকদের অনুসরণ করার ব্যাপারে। [তানবীরুল মিক্বাস মিন তাফসীরি ইবনে আব্বাসঃ ১/১৫৩]

সেই জামানার খারেজীরা যে বিষয় নিয়ে কোন্দল সৃষ্টি করেছিল তা যদি حكم তথা বিচার পরিচালনাকে تشـــريع তথা আইন প্রণয়নের অর্থে নিত, তাহলে ইবনে আব্বাস (রাঃ) কিছুতেই আইন প্রণয়নকে كفـــر دون كفر বলতেন না। আর এটা বলা কিভাবেই বা তার পক্ষে বলা সম্ভব? কারণ তিনি তো ছিলেন কুরআনের উত্তম ব্যাখ্যাকারী।

বরং ঐ জামানার খারেজীরা,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করে না তারাই কাফের।"[সূরা মায়িদাঃ ৪৪]

এই আয়াতটি সাহাবায়ে কিরামের কিছু ইজতিহাদী বিষয়কে ভুল সাব্যস্ত করে ব্যবহার করত।

তার একটি দৃষ্টান্ত হল যখন আলী (রাঃ) এবং মুওয়াবিয়া (রাঃ) এর মধ্যে মতপার্থক্য এবং ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য উভয় পক্ষ থেকে একজন করে সালিস নির্ধারণ করা হল। তখন খারেজীরা ক্ষেপে উঠলো এবং বলতে লাগল حكمتم الرجـــال 'তোমরা মানুষদেরকে বিচারের ভার দিয়েছো' অতঃপর এই আয়াত পাঠ করতে লাগলঃ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করে না তারাই কাফের।"

এবং তারা দাবি করত যে ব্যক্তিই বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে সামান্য কমবেশী করল, তার ব্যাপারেই বলা যাবে যে, সে আল্লাহর বিধান মোতাবেক বিচার পরিচালনা করল না সুতরাং সে কাফের। তাই তারা নিযুক্ত উভয় বিচারক

এবং তাদের বিচারের ব্যাপারে যারা সন্তুষ্ট ছিল সকলকে কাফের বলে ঘোষণা করল। এমনকি আলী (রাঃ) এবং মুওয়াবিয়া (রাঃ)-কেও কাফের বলতে লাগল (নাউযুবিল্লাহ)। আর এটাই ছিল খারেজীদের ইসলামের গন্ডি থেকে বের হওয়ার প্রথম কারণ। আর এ কারণেই তাদের প্রথম ফেরকাকে محكمة 'মাহকামাহ্' বলা হয়।

এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) তাদের সাথে আলোচনা পর্যালোচনা করলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছিলেন যাদের অন্যতম। তিনি তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, এই বিচারক নির্ধারণ মুসলমানদের মাঝে বিবাদ মিটানোর জন্য। এটাতো আল্লাহর বিধান ব্যতিরেকে এমন বিচার পরিচালনার জন্য নয় যাকে কুফরী বলা যায়। এবং তিনি প্রমাণ স্বরূপ কুরআনের আপর একটি আয়াত পেশ করলেন যা অবতীর্ণ হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ মেটানোর জন্য।

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

"আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক পাঠাও।" [সূরা নিসাঃ ৩৫]

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিবাদ মিটানোর জন্য যদি বিচারক নির্ধারণ বৈধ হয় তাহলে মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতের মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য কেন বৈধ হবে না?

ইতিহাসে উল্লেখ আছে এভাবে তিনি আরো দলিল পেশ করেন। এবং তিনি বলেন এই বিষয়টিকে (যদিও তার মাঝে কিছু ভুল-ভ্রান্তি ও সত্যবিচ্যুতি হয়েছে) তোমরা যে ধরণের কুফর মনে করছ এটা সে ধরণের বড় কুফর নয়। আর এ কথার উপর ভিত্তি করেই كفر دون كفر বাক্যটিকে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। এ ঘটনার পর তাদের একদল ভুল বুঝতে পেরে সত্য পথে ফিরে আসে। অপর দল আপন অবস্থায় অটল থাকে। অতঃপর আলী (রাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

সুতরাং একটু ভেবে দেখুন! আল্লাহর সাথে নিজেকেও বিধানদাতা বানানো, আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করা, গাইরুল্লাহকে বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ করা, গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র অথবা অন্য কোন তন্ত্র-মন্ত্রকে দ্বীনরূপে গ্রহণ করা

আর অন্য দিকে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এবং খারেজীদের মাঝে যে বিষয়ে মতানৈক্য হয়েছে এবং সাহাবায়ে কিরাম তাদের সাথে কথা বলে তাদের দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন ও ছোট কুফর বলে ঘোষণা দিয়েছেন এই দুই বিষয়ের মাঝে আদৌ কি সামান্যতম মিল আছে? **তাহলে সাহাবায়ে কিরামের এই ঘটনার দ্বারা বর্তমান সময়ে দলিল পেশ করে এই সমস্ত স্পষ্ট এবং জঘন্য কাফেরদের পক্ষে কেন সাফাই গাওয়া হচ্ছে?**

সারকথা হলঃ আল্লাহ (সুবঃ) এর বাণীঃ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করে না তারাই কাফের।" এটা দুই ধরণের কুফরকে শামিল করেঃ বড় কুফর ও ছোট কুফর। ইসলামী শরীয়ার অনুসারী মুসলিম শাসক যদি জুলুম অথবা অন্যায়ভাবে বিচার পরিচালনা করে তাহলে তা ছোট কুফর। আর যদি নিজের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়ন করে তাহলে তা হবে স্পষ্ট বড় কুফর।

আর এ কারণেই সালাফে সালেহীনগণ এই আয়াতকে যখন প্রথম ক্ষেত্রে (অর্থাৎ জুলুম ও অন্যায়ের ক্ষেত্রে) ব্যবহার করতেন তখন এটাকে ছোট কুফরের অর্থে ব্যবহার করতেন। আর যখন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (অর্থাৎ আইন প্রণয়ন ও আইন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে) প্রমাণ পেশ করতেন তখন এটাকে স্বাভাবিক তথা বড় কুফরের অর্থে গ্রহণ করতেন। যদিওবা এই আয়াতের মূল অর্থ হল বড় কুফর। কেননা এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল ইহুদীদের সম্পর্কে যখন তারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়েছিল এবং নিজেদের তৈরী আইনের উপর ঐক্যমত পোষন করেছিল। আর তাদের এই কাজ ছিল প্রকাশ্য বড় কুফর যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এই বিষয়টিতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমনটি সহীহ মুসলিমে আছেঃ

مُرَّ عَلَى النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– بِيَهُودِىٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا فَدَعَاهُمْ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِى فِى كِتَابِكُمْ ».

قَالُوا نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ « أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِى فِى كِتَابِكُمْ ». قَالَ لاَ وَلَوْلاَ أَنَّكَ نَشَدْتَنِى بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِى أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا

أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ قُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « اللَّهُمَّ إِنِّى أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ ». فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِى الْكُفْرِ) إِلَى قَوْلِهِ (إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ) يَقُولُ ائْتُوا مُحَمَّدًا –صلى الله عليه وسلم– فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) فِى الْكُفَّارِ كُلُّهَا

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার জিনার অপরাধে দন্ডপ্রাপ্ত কালিমাখা এক ইয়াহুদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন রাসূল (সাঃ) ইয়াহুদীদেরকে ডাকলেন এবং বললেন তোমাদের কিতাবে কি জিনার শাস্তি এটাই আছে? তারা বলল হ্যাঁ! অতঃপর রাসূল (সাঃ) তাদের একজন আলেমকে ডাক দিয়ে বললেন, তোমাকে ঐ সত্তার শপথ করে বলছি যিনি মুসা (আঃ) এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা কি তোমাদের কিতাবে জিনার শাস্তি এমনটিই পেয়েছ? সে বলল, আল্লাহর শপথ! আপনি যদি আমাকে শপথ না দিতেন তাহলে আমি আপনাকে বলতাম না, আমরা আমাদের কিতাবে জিনার শাস্তি পেয়েছি 'রজম' (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা)। কিন্তু আমাদের মর্যাদাশীল ব্যক্তিরা অহরহ জিনায় জড়িয়ে পড়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের মধ্য থেকে যখন কোন মর্যাদাবান লোক জিনা করত আমরা তাকে ছেড়ে দিতাম। আর কোন সাধারণ লোক জিনা করলে আমরা তার উপর 'হদ' (দন্ডবিধি) কায়েম করতাম। পরবর্তীতে আমরা এ বিষয়ে পরস্পরে পরামর্শ করলাম। যে, আসুন আমরা জিনার জন্য এমন একটি বিধান প্রণয়ন করি যা বিশিষ্ট সাধারণ সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। তখন কালি মাখা এবং দোররা মারার ব্যাপারে আমাদের ঐকমত হয়। এতদশ্রবণে রাসূল (সাঃ) বললেন, হে আল্লাহ আমিই সর্বপ্রথম তোমার এমন আদেশকে জীবিত করেছি যে আদেশকে তারা শেষ করে ফেলেছিল। তখন আল্লাহ (সুবঃ) অবতীর্ণ করেনঃ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (والظالمون, والفاسقون)

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করে না তারাই কাফের"[৬] (যালেম[৭] ও ফাসেক[৮])। এ সবগুলো আয়াত কাফেরদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়। [সহীহ মুসলিমঃ কিতাবুল হুদূদঃ ২৮-(১৭০০)]

যদি খারেজীরা এই আয়াতকে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করত যে ইয়াহুদীদের মত আল্লাহর আইনকে পরিবর্তন কিংবা বর্জন করে নিজেদের রচিত আইন দ্বারা বিচার ফায়সালা করে তাহলে আব্বাস (রাঃ) সহ অন্য সাহাবায়ে কিরাম কিছুতেই তাদের এই সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করতেন না এবং এই আয়াতের আসল অর্থই বর্ণনা করতেন। অন্য কোন ব্যাখ্যার দিকে যেতেন না। আসল ব্যাপার হল সেই যামানায় এ ধরণের বড় কুফর অর্থাৎ আল্লাহর আইনকে পরিবর্তন করে মানব রচিত আইনে বিচার পরিচালনার অস্তিত্বই ছিলনা। কারণ যদি এর অস্তিত্ব থাকতই তাহলে তারা এর প্রমাণ স্বরূপ শুধু এই একটি আয়াত কেন বরং এর চেয়ে বেশী স্পষ্ট ও অধিক উপযোগী একাধিক আয়াত পেশ করত। (যে সমস্ত আয়াতের ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।) যেমন আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

অর্থঃ 'তাদের কি এমন শরীক আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি।' [সূরা শু'রা : ২১]

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

আর শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্ররোচনা দেয়, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিবাদ করে। আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক। [সূরা আনআমঃ ২১]

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

অর্থঃ 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন কবুল করতে চাবে তার থেকে তা কবুল করা হবে না।'[আল ইমরানঃ ৮৫]

---

[৬] সূরা মায়িদাঃ ৪৪।

[৭] সূরা মায়িদাঃ ৪৫।

[৮] সূরা মায়িদাঃ ৪৭।

এ সকল স্পষ্ট ও অকাট্য আয়াতকে এই জন্য দলিল হিসেবে পেশ করে নাই যে, আলোচ্য আয়াতগুলোর কোন একটি বিষয়ও সাহাবায়ে কিরামের সময় বিদ্যমান ছিল না।

সুতরাং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) খারেজীদের উত্তরে যে কথা বলেছিলেন তা এই জামানার কুফর ও শিরক নিমজ্জিত শাসনের পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা নিতান্তই অযৌক্তিক ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি এই কাজটি করে তাহলে সে সত্যকে মিথ্যার চাদরে ঢেকে ফেলার অপচেষ্টা চালালো এবং আলোকে আঁধারে পরিণত করার ব্যর্থ চেষ্টায় লিপ্ত হল। বরং (কা'বার রবের শপথ!) সে এক ভয়ানক অপরাধ করল।

ভাবার বিষয় হল, খারেজীরা সাহাবায়ে কিরামের যে বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা করেছিল সেটি এবং বর্তমান শাসকদের অবস্থা এক নয়। বরং উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি উভয় বিষয়কে এক মনে করে, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় সাহাবায়ে কিরামের বিষয়টি এবং এই সমস্ত শিরক দুটি একই মাপের। আর সাহাবায়ে কিরামকে তাদের সমমাপের মনে করা মানে সাহাবায়ে কিরামকেও তাদের মত কাফের ভাবা (নাউযুবিল্লাহ)। আর যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরামদের তাকফীর করবে সে নিজেই কাফের হয়ে যাবে। কেননা সাহাবায়ে কিরামের প্রতি আল্লাহ (সুবঃ) সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা কুরআনের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং ঐ সমস্ত শাসকদের শিরকসমূহ থেকে কোন একটিকেও যদি সাহাবায়ে কিরামের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয় তাহলে তা কুরআনের স্পষ্ট আয়াতকে অস্বীকার করা হবে অথবা আল্লাহর ব্যাপারে বলা হবে যে, তিনি কাফেরদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন! আর এই সবগুলোই কুফরী।

সুতরাং হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। এবং সাহাবায়ে কিরামের কাজকে এই জামানার কাফেরদের সাথে তুলনা করে নিজেদের কে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।

দ্বিতীয় সংশয়:
তারা তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে।

তারা বলে: কিরূপে তোমরা আইন প্রণয়নকারী শাসকবৃন্দ ও তাদের সাহায্যকারী সমস্ত সৈনিক, নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্য ও অন্যদেরকে কাফের ঘোষণা দাও? আর এ কারণে তোমরা তাদেরকে সালাম পর্যন্ত দাওনা, তাদের সাথে কাফের সূলভ আচরণ কর। অথচ তারা সাক্ষ্য দেয় لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।' তোমাদের কাছে কি উসামা (রাঃ) এর ঘটনা পৌঁছেনি?

উসামা বিন যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ) বলেন যে, রাসূল (সাঃ) জুহায়না গোত্রের হুরাকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আমাদের পাঠালেন। আমরা খুব ভোরে সে সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করলাম এবং আমরা তাদের পরাজিত করলাম। আমি এবং একজন আনসার এক ব্যক্তির পিছু নিলাম। আমরা যখন তাকে ঘিরে ফেল্লাম তখন সে لا إلـــه إلا الله বলল, আনসার তার মুখে কালিমা শুনে নিবৃত হলেন। কিন্তু আমি তাকে বল্লম দ্বারা এমন আঘাত করলাম যে, তাকে মেরেই ফেল্লাম। আমরা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে এলে নাবী (সাঃ) এর নিকট এ খবরটি পৌঁছলো। তিনি আমাকে ডেকে বললেন ঃ হে উসামা ! তুমি কি তাকে لا إله إلا الله বলার পরেও হত্যা করে ফেলেছ? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে ব্যক্তিতো আত্মরক্ষার জন্যে এ কথা বলেছিল। রাসূল (সাঃ) আবার বললেনঃ তুমি কি তাকে لا إلـــه إلا الله বলার পরে হত্যা করেছ? এভাবে রাসূল (সাঃ) বার বার আমার প্রতি একথা বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আমার মনে এ আকাঙ্ক্ষা উদয় হলো যে, হায়! আজকের এ দিনের আগে আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম। [সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান: ১৫৯-(৯৬)]

আর আল্লাহ (সুবঃ) এরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

অর্থ: 'হে মুমিনগণ, তোমরা যখন আল্লাহর পথে বের হবে তখন তোমরা পরীক্ষা করবে, আর তোমাদের কেহ সালাম করলে তাকে তোমরা বল না যে তুমি মুমিন না'। [নিসা :৯৪]

এমনিভাবে হাদীসে এরশাদ হয়েছে:

من مات و هو يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة

অর্থ: 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল আর সে সাক্ষ্য দিত আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। [মুসনাদে আহমাদ সহীহ সনদে: ২২০০৩; তাবারানী ৭৯/২০; নাসাঈ: ১১৩৪; ইবনে খুজায়মা: ২/৭৮৭]

এমনিভাবে হাদীসে এক ব্যক্তির ব্যাপারে এসেছে, যে কিয়ামত দিবসে ৯৯ টি গোনাহের খাতা বহন করে আনবে আর সে নিজেকে ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ভাববে। এই খাতা গুলোকে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ লিখিত একটি চিরকুটের সাথে ওজন দেয়া হবে। অতঃপর চিরকুটের পাল্লাই ভারি হবে। [সুনানে ইবনে মাজা: ৪৩০০, তিরমিযী: ২৬৩৯; সনদ: সহীহ]

আরো এক হাদীসে এসেছে,

يسري على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية و يبقى طوائف من النـاس الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها قال صلة بن زفر لحذيفة فما تغني عنهم لا إله إلا الله و هم لا يدرون ما صيام و لا صدقة و لا نسك ..... فقال : يا صلة تنجيهم من النار

"হুযাইফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন কোন এক রাত্রিতে কিতাবুল্লাহকে উঠিয়ে নেয়া হবে, তার থেকে একটি আয়াতও জমিনে অবশিষ্ট থাকবে না। বৃদ্ধ মানুষের একটি দল থাকবে যারা জানবে না যে, সিয়াম কী জিনিস, সদকা কী জিনিস আর কুরবানীই বা কী জিনিস। তারা বলবে আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এই কালিমা (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّـه) এর উপর পেয়েছি, তাই আমরা এই কালিমা পাঠ করি। সেলাহ (হাদীস বর্ণনাকারী) (রহঃ) জিজ্ঞাসা করলেন لَا إِلَهَ إِلَّـا اللَّـه তাদের কী উপকারে আসবে ? অথচ তারা জানে না সালাত কী জিনিস,সাদাকা কী জিনিস, কুরবানী কী জিনিস! হযরত

হুযাইফা (রাঃ) উত্তরে বললেন, হে সেলাহ! 'কালিমা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে।" [মুসতাদরাকে হাকেম: ৮৬৩৫; হাকেম বলেন ইমাম মুসলীমের শর্তানুসারে সহীহ; ইমাম যাহাবী সনদের ব্যাপারে চুপ থেকেছেন।]

আমাদের জবাব: আল্লাহ (সুবঃ) ইরশাদ করেন:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ

অর্থ: 'তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু আয়াত 'মুহকাম' এইগুলি কিতাবের মূল আর অন্যগুলি 'মুতাশাবিহ' যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে আমরা ইহা বিশ্বাস করি" [আল ইমরান :৭]

সুতরাং আল্লাহ (সুবঃ) স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন: তিনি মানুষের জন্য প্রেরিত শরীয়তে কিছু মুহকাম আয়াত (স্পষ্ট আয়াত) দিয়েছেন- যার উপর শরীয়তের মূল ভিত্তি। মতবিরোধের সময় তার (মুহকাম আয়াত) থেকেই ফয়সালা গ্রহণ করতে হবে। এর বিপরীতে রয়েছে কিছু মুতাশাবিহ আয়াত (অস্পষ্ট আয়াত) যেগুলোর অর্থ একাধিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে প্রমাণের ক্ষেত্রে অস্পষ্ট। যার অর্থ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানেনা। এ ধরণের আয়াতের দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো বান্দাদেরকে পরীক্ষা করা যে, তারা কোন আয়াতগুলোর অনুসরণ করে।

অতএব যারা ভ্রান্তিবিলাসে মত্ত এবং পথভ্রষ্ট তারা এই মুতাশাবিহ আয়াত সমূহের অনুসরণ করে, আর মুহকাম আয়াত সমূহ ছেড়ে দেয়। যাতে করে তারা এই আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা দিতে পারে এবং মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে।

যারা সত্যের অনুসারী ও মজবুত ইলমের অধিকারী তারা মুতাশাবিহ আয়াত সমূহকে মুহকামের উপর ন্যস্ত করেন। কেননা মুহকাম আয়াত হলো কিতাবুল্লাহ্‌র মূল অংশ এবং এর উপরই তার ব্যাখ্যার ভিত্তি।

ইমাম শাত্বিবী (রহঃ) তার "আল ই'তেসাম" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, এই নিয়মটি শুধুমাত্র কিতাবুল্লাহ্র জন্যই নয়, বরং ইহা হাদীস ও সীরাতে রাসূল (সাঃ) এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ এমন কিছু হাদীস এবং ঘটনা বর্ণিত আছে যাতে বলা হয়েছে বা যা সংঘঠিত হয়েছে বিশেষ কোন পরিস্থিতিকে সামনে রেখে (যে হাদীসগুলো মুতাশাবিহ এর পর্যায়ে)।

সুতরাং এমন কোন হাদীসকে যদি গ্রহণ করা হয়, আর তার সাথে সম্পর্কিত অথবা তার মূল অর্থ ব্যাখ্যাকারী অপর হাদীসকে (যা মুহকামের পর্যায়ে) ছেড়ে দেয়া হয়। তাহলে এটা মুহকামকে বাদ দিয়ে মুতাশাবিহ গ্রহণ করার মতই হবে।

এমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি কোন "আ'ম"কে তার "মুখাসসিস"(মুখাসসিস / মুকায়্যিদঃ ঐ বিষয়কে বলা হয় যার দ্বারা আ'ম তথা ব্যাপক ভাবে উল্লেখিত বিষয়কে শর্তযুক্ত করা হয়।) ব্যতিরেকে অথবা কোন "মুত্বলাক্ব"কে (আ'ম/ মুত্বলাক্ব ঃ ঐ বিষয় যাকে কোন ধরণের শর্ত ছাড়া ব্যাপকতার সাথে উল্লেখ করা হয়।)তার "মুকায়্যিদ" ব্যতিরেকে গ্রহণ করে অথবা অনেকগুলো মূলনীতি থেকে তার ইচ্ছামত এক-দুটি গ্রহণ করে তাহলে এটা এমন হবে যে, পরস্পর অপরিহার্য দুটি বিষয়ের মধ্য হতে একটিকে গ্রহণ ও অপরটিকে বর্জন করা হল।

উল্লেখিত সবগুলো বিষয়, মুহকাম কে বাদ দিয়ে মুতাশাবিহ গ্রহণ করার নামান্তর। আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করল সে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আল্লাহর ব্যাপারে চরম মিথ্যাচার করল এবং শরীয়াত যা বলেনি তা শরীয়াতের সাথে যুক্ত করে দিল।

অথচ তার উপর জরুরী ছিল আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাঃ) এর সকল কথার প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং সবগুলো গ্রহণ করা ও পরিপূর্ণ ভাবে মেনে চলা।

কেননা নিজের মনমত যা হয় তা মেনে নিয়ে বাকি গুলোকে ছেড়ে দেয়া, পথভ্রষ্টদের রীতি এবং অধিকাংশ ভ্রান্তদের ভ্রান্তির কারণ।

কেননা খারেজীরা ঐ সময় ভ্রান্ত হয়েছে যখন তারা কিছু 'নস' (আয়াত এবং হাদীস) কে গ্রহণ করেছে এবং কিছু নস কে ছেড়ে দিয়েছে। তারা আল্লাহ তা'আলার এই আয়াতকে গ্রহণ করেছে,

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

অর্থ: 'আর যদি কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাঃ) অবাধ্য হয়, আর তাঁর নির্ধারিত সীমালংঘন করে, তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্যে অপমানজনক শাস্তি রয়েছে। [নিসা :১৪]

এই আয়াতের ভিত্তিতে তারা, যে ব্যক্তিই কবিরা গুনাহ করত, তাকেই অমুসলিম ঘোষণা করত। অথচ ইহা হলো একটি 'আ'ম' আয়াত, যার সঠিক মর্ম তার 'মুখাসসিস' ছাড়া অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তার মুখাসসিস হলো অপর একটি আয়াত,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শরীক করাকে এবং এ ছাড়া যাকে চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো ঘোর পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হল।" [নিসা :১১৬]

এই আয়াতের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে তারা শুধু প্রথম আয়াতের ভিত্তিতে বিধান বর্ণনা করেছে, ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

এমনিভাবে মুরজিয়ারা পথভ্রষ্ট হয়েছে শুধু ঐ সমস্ত 'নস' (আয়াত ও হাদীস) কে গ্রহণ করার কারণে যেগুলোতে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

যেমন: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة অর্থ: "যে ব্যক্তি لا اله الا الله পাঠ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে" [তিরমিজী: ২৬৩৮; মুসনাদে আহমাদ: ২২২০৩; সনদ: হাসান]

তাই তারা আমলের ব্যাপারে চরম অবহেলা করেছে এবং ভেবেছে যে, কোন ব্যক্তি মুসলিম হওয়া এবং জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য শুধু কালিমা পাঠ করাই যথেষ্ট। যদিও সে (যারা শুধু মুখে কালেমা উচ্চারণ করাকে ঈমানের জন্য যথেষ্ট মনে করে) কালিমার শর্ত সমূহ বাস্তবায়ন এবং তার দাবি সমূহ পূরণ করে না; এমনকি যদিও তা তার জন্য সম্ভব ছিল এবং তার সাধ্যের মধ্যেই ছিল।

অথচ উলামায়ে কেরাম শর্তগুলো ও দাবিগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) সহীহ বুখারীতে ওহাব বিন মুনাব্বাহ এর বরাতে উল্লেখ করেন,

وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة ؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك

"ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ কে বলা হল لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه কি জান্নাতের চাবি না? তিনি বললেন হ্যাঁ! সকল চাবির জন্য দাঁত আবশ্যক, যদি তুমি দাঁত যুক্ত চাবি নিয়ে আস, তাহলে তোমার জন্য (জান্নাত) খুলে যাবে অন্যথায় নয়।" [সহীহ বুখারীর ১২৩৭ নং হাদীসের ভূমিকা]

কালিমার দাঁত হলো তার শর্ত সমূহ পূর্ণ করা এবং এই দাঁতকে বিনষ্ট করে এমন কাজ থেকে বিরত থাকা ।

কেননা যে ব্যক্তি দ্বীন-ইসলামের হাকীকত অর্থাৎ অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পেরেছে সে নিশ্চিত ভাবে জানে যে, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার মাঝে নিহিত অর্থ {الكفر بالطاغوت}"তাগুতকে অস্বীকার" ও {ألإيمان بالله} "আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস"।

সুতরাং কালিমার অন্তর্নিহিত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা ও তার দাবিগুলো পূর্ণ করা এবং তার বিপরীতমূখী জিনিস থেকে বিরত থাকা ব্যতীত শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণ করা আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়। তাইতো আল্লাহ পাক এরশাদ করেন فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه অর্থ: "তুমি জেনে রাখ তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই"। [সূরা মুহাম্মাদ:১৯](এই আয়াতে জানার কথা বলা হয়েছে।)

তিনি আরো এরশাদ করেন: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ "তবে তারা ছাড়া যারা জেনে–শুনে সত্য সাক্ষ্য দেয়" [সূরা যুখরুফ :৮৬]

(এখানেও জেনে-বুঝে সাক্ষ্য দেয়ার কথা বলা হয়েছে।)

এমনিভাবে হাদীসে এসেছে:

من مات و هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة

অর্থঃ 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, আর সে জানত; আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।' [মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন লিল হাকেম: ২৪২; সনদ: সহীহ]

উল্লেখিত হাদীসে এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, শুধু উচ্চারণ নয় বরং অর্থ জানা এবং বিশ্বাস করা কালিমার জন্য শর্ত।

আর এই কালিমার অর্থ দুটি জিনিসকে অন্তর্ভূক্ত করে এক. আল্লাহর এককত্বকে মেনে নেয়া। দুই. আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল উপাস্য কে বর্জন করা। ইমাম নববী (রহঃ) এই কালিমার উপর সহীহ মুসলিমে একটি অধ্যায় বিন্যাস করেছেন তা হলো- باب من مات علي التوحيد دخل الجنـــة "অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর মৃত্যুবরণ করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এখানে আমাদের লক্ষণীয় বিষয় হল যে, তিনি من قال "যে বলল" বলেননি, বরং তিনি বলেছেন من مات علـــي التوحيـــد "যে তাওহীদের উপর মৃত্যুবরণ করল"। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাওহীদকে নিশ্চিতভাবে বাস্তবায়ন করা, যে তাওহীদ এই কালিমার অর্থের মধ্যে নিহিত আছে।

কালিমার হক গুলো আদায় না করে এবং তার বিপরীতমুখী বিষয় সমূহ থেকে বিরত না থেকে শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণ করা কালিমার উদ্দেশ্য নয়। যেমন বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) মুআয (রাঃ) কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় অসিয়ত করেছিলেন এবং দাওয়াতের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে, বলেছিলেন:

فليكن اول ما تدعوهم الي ان يوحدوا الله

"সর্বপ্রথম তুমি তাদেরকে দাওয়াত দিবে তারা যেন তাওহীদকে স্বীকার করে নেয়।"

[সহীহ মুসলীম ৩১-(১৯) তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স; সহীহ বুখারী:৭৩৭২]

এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, কালিমার অর্থ হলো গ্রহণ ও বর্জন। শুধু মাত্র মুখে উচ্চারণ নয়।

সুতরাং এই সমস্ত মুসলিম বেশধারী তাগুতদের সৈনিক ও অন্যান্য সাহায্যকারী, যারা এই তাগুতদেরকে অস্বীকার করাতো দূরের কথা বরং তাগুতদের সাহায্য করে, তারা মুসলিম হতে পারে না।

তাই তারা যদি এই শিরকের উপরেই মারা যায় তাহলে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদিও তারা হাজার বার মুখে لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ উচ্চারণ করে।

মুসায়লামাতুল কাযযাবের অনুসারীরা لَا إِلَٰهَ إِلَّـــا اللَّـــه বলতো, সালাত আদায় করতো, সিয়াম পালন করতো। মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর নাবী ও রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করত। কিন্তু তারা শুধুমাত্র রাসূলের রিসালাতের সাথে

অপর এক ব্যক্তিকে শরীক করতো, ফলে তারা কাফের হয়ে গেছে। তাদের রক্ত ও সম্পদ মুসলিমদের জন্যে হালাল হয়ে গেছে। কালিমা পাঠ তাদের কোনই উপকারে আসেনি। একটি মাত্র কারণ ছিল, আর তা হলো রাসূলের রিসালাত ও নবুওয়্যতে অপর একজনকে অংশীদার করা। তাহলে ঐ ব্যক্তির অবস্থা কী হবে যে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সৃষ্টিকর্তার সাথে অপর কাউকে শরীক করে?

উল্লেখিত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম, কালিমা শুধু মুখে উচ্চারণই যথেষ্ট হবে না বরং তার অর্থ জানতে হবে ও শর্ত মানতে হবে।

বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম কালিমার শর্ত সমূহ উল্লেখ করেছেন এবং এর প্রমাণগুলো পেশ করেছেন। যাতে কোন মুসলিম এটাকে শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণের বাক্য না ভাবে।

শর্তগুলো এই:

(১) কালিমার দাবিগুলো জানা থাকা অর্থাৎ গ্রহণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো জানা থাকা।

(২) কালিমার দাবিগুলো অবনত মস্তকে মেনে নেয়া ।

(৩) মুখে উচ্চারণ করা এবং অন্তরে বিশ্বাস করা।

(৪) সব ধরণের শিরক থেকে মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র এক আল্লাহর জন্য আমল করা।

(৫) কালিমার দাবিগুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এবং এতে কোন সংশয় না রাখা।

(৬) কালিমার শর্তপূরণকারী এবং তদানুযায়ী আমলকারীর প্রতি আন্তরিক ভালবাসা রাখা। কালিমার বিরোধীতাকারীদের প্রতি ঘৃণা রাখা।

(৭) কালিমার সব দাবি মুখে ও অন্তরে গ্রহণ করে নেয়া এবং যারা এই কালিমা কে অস্বীকার করে এবং বিরোধিতা করে তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

এই অধ্যায়ের শুরুতে প্রতিপক্ষের উল্লেখিত দ্বিতীয় হাদীস:

من مات و هو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এই কথা সাক্ষ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” [মুসনাদে আহমাদ :১৬৪৮৩ ; সনদ সহীহ]

এর জবাবে আমরা বলব: এই হাদীসটির সঠিক অর্থ বুঝার জন্য তাকে কিতাবুল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ের সাথে মিলাতে হবে। কেননা হাদীসের যে অর্থ তারা গ্রহণ করেছে তা কিতাবুল্লাহর সাথে সাংঘর্ষিক। আয়াতদ্বয় হলো :

এক.

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا

অর্থ: "অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। [সূরা বাক্বারা: ২৫৬]

দুই.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শরীক করাকে এবং এ ছাড়া যাকে চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো ঘোর পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হল।" [সূরা নিসা: ১১৬]

সুতরাং কোন মুশরিক যদি হাজার বার لا إلــه إلا الله পাঠ করে এবং তার অর্থকে অনুধাবনও করে, কিন্তু শিরক করে এবং তাগুতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। যেমন তিনি বলেছেন

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

"অর্থ: নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শিরক করবে,আল্লাহ তা'আলা তার উপর জান্নাত হারাম করবেন। আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।" [মায়েদা ৫:৭২]

এ বিষয়ে অন্য হাদীসগুলোও আমাদের জানা থাকা উচিৎ । তাহলে প্রকৃত অবস্থা বুঝতে সহজ হবে। হাদীসে এসেছে:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ لاَ يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَــا إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ (صحيح مسلم)

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহর রাসূল"। যে ব্যক্তি এই দুই সাক্ষ্য প্রদান করে

আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, সে এ ব্যাপারে সন্দিহান ছিল না, তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" [সহীহ্ মুসলিমঃ কিতাবুল ঈমান: ৪৪-(২৭)]

অপর হাদীসে এসেছেঃ

ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار

"অর্থ যে ব্যক্তি সত্য হৃদয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল' আল্লাহ তার জন্যে জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন।" [সহীহুল বুখারী :১২৮ আ.প্র.১২৫,ই.ফা.১৩০[৯]]

এ ধরণের আরো অন্যান্য হাদীসেও বিষয়টি পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট রয়েছে। আর এভাবেই সকল নস (আয়াত ও হাদীস) এর সমন্বয়ে দ্বীন বুঝে আসে, ইলম অর্জিত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও ইচ্ছা জানা যায়।

এ কারণেই ইমাম নববী (রহঃ) এধরণের (من مـات و هويشـهد) হাদীসের ব্যাখ্যায় কতিপয় আলেমের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

'হাসান বসরী (রহঃ) এর মত হলোঃ এই হাদীসগুলো 'মুজমাল' তথা সংক্ষিপ্ত যার ব্যাখ্যা আবশ্যক। উক্ত হাদিসে উদ্দেশ্যিত ব্যক্তি হলো সে, যে কালিমা মুখে উচ্চারণ করবে তার হক্ব আদায় করবে এবং তার আবশ্যকীয় বিষয়গুলো পালন করবে।'

'ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেনঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ ব্যক্তি যে, তাওবা ও রোনাজারীর সময় এই কালিমা পাঠ করে এবং তার থেকে ঈমান বিনষ্টকারী কোন কথা বা কাজ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে।'

আমরা পূর্বোক্তি আলোচনার দ্বারা বুঝতে পেরেছি যে, তাওহীদের মূল ভিত্তি হল الكفر بالطاغوت (তাগুত্বকে অস্বীকার করা) ও الإيمان بـالله (আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন) এবং এই কালিমার যাবতীয় শর্তসমূহ পূরণ করা। অতএব হাদীসে বেতাকার (চিরকুটের হাদীস) সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য সেটাকে আল্লাহর স্পষ্ট আয়াতের সাথে মিলাতে হবে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

---

[৯] আ.প্র. অর্থ আধুনিক প্রকাশণীর সহীহুল বুখারী আর ই.ফা. অর্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সহীহুল বুখারী।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শরীক করাকে এবং এ ছাড়া যাকে চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো ঘোর পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হল।" [সূরা নিসা: ১১৬]

অতএব সে যে ৯৯ টি খাতা নিয়ে এসেছিল সেগুলো কিছুতেই কুফুর বা শিরক ছিল না বরং অন্য কোন গুনাহ ছিল। কেননা শিরককারীকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না এবং জান্নাত তাদেরে জন্যে হারাম। কারণ এই সমস্ত রেজিষ্টারের মধ্যে কোন একটি গুনাহ যদি ঈমান বিধ্বংসী হত তাহলে তার বেতাকা তথা চিরকুটের ওজন ভারী হত না এবং ঐ ব্যক্তি নাজাতও পেত না। কারণ তার এই চিরকুট তখন সঠিক তাওহীদের হত না, বরং এটা হত মুখ নিসৃত একটি বাক্য মাত্র। যার অর্থের দিকে লক্ষ্য করা হয়নি এবং তার দাবিও পূর্ণ করা হয়নি।

এই সমস্ত রেজিষ্টারের মধ্যে যদি গাইরুল্লাহর জন্য ইবাদাত এবং আল্লাহর সাথে বিধানদাতা সাব্যস্ত করা অথবা বিধানদাতাকে সাহায্য করা, তাদের সাথে ভালোবাসা রাখা, দ্বীন-ধর্মকে কটাক্ষ করা এবং দ্বীনের মুজাহিদগনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত কোন অপরাধ থাকে তাহলে এই চিরকুট কোন কাজেই আসবে না কেননা এই সকল অপরাধ মানুষকে ব্যর্থ-বিফল করে দেয় এবং তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেয়। বরং এই রেজিষ্টার সমূহ ছিল শিরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যা তাওহীদ বিনষ্টকারী নয়।

উক্ত হাদীসে তাওহীদের গুরূত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানো হয়েছে এবং এটাই বুঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি তাওহীদ কে মেনে নিবে এবং স্বীয় প্রভূর সন্তুষ্টি অনুযায়ী সে তার শর্তগুলো পূরন করবে। আল্লাহ (সুবঃ) তার বাকি সব গুনাহ ক্ষমা করবেন। হাদীসে কুদসীতে এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত আছে:

يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة

"হে আদম সন্তান! তোমরা যদি দুনিয়া সমান গুনাহ নিয়েও আমার কাছে আস অতঃপর আমার সাথে সাক্ষাৎ কর এমতাবস্থায় যে, তোমরা আমার

সাথে কাউকে শরীক করনি, তাহলে আমি তোমাদেরকে তার সমপরিমাণ মাগফিরাত দান করব।"[সুনানে তিরমিযী: ৩৫৪০; সিলসিলাতুস সাহীহাহ লি আলবানী: ২৮০৫; সনদ: সহীহ]

উল্লেখিত হুযাইফা (রাঃ) এর হাদীসটি (يسري على كتاب الله في ليلـــة ....) যদি সহীহ হয়[১০], তাহলে এর উদ্দেশ্য হবে, ঐ সমস্ত লোক যারা এই কালিমা ব্যতীত শরীয়তের অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে বে-খবর। সে এই কালিমার শর্তগুলো পূর্ণ করবে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। (কেননা আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে) তাহলে তারা তাওহীদে বিশ্বাসীদের মধ্যে গন্য হবে। আর তারা যে সালাত, যাকাত, কুরবানী ইত্যাদী আদায় করেনি এ জন্য আল্লাহর নিকট ওযর পেশ করবে কেননা প্রমাণ ছাড়া শরীয়াত বুঝা সম্ভব নয়, অথচ হাদিসে উল্লেখ আছে, তাদের সময় কিতাবুল্লাহ কে উঠিয়ে নেয়া হবে, ফলে তার একটি আয়াতও বাকী থাকবে না। আর কিতাবুল্লাহ হল এমন এক হুজ্জত (প্রমাণ) যাকে আল্লাহ (সুবঃ) অবতীর্ণ করেছেন মানুষদেরকে সতর্ক করার জন্য। আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন:

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ

অর্থ: 'আর এ কুরআন আমার কাছে ওহী করে পাঠানো হয়েছে যেন তোমাদেরকে ও যার কাছে এটা পৌছবে তাদেরকে এর মাধ্যমে আমি সতর্ক করি।' [সূরা আন'আম: ১৯]

সুতরাং যার নিকট কুরআন পৌছবে তার আর কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যার নিকট কুরআন পৌছবে না সে শরীয়ার শাখাগত বিষয়ে অক্ষম বিবেচিত হবে কিন্তু সে তাওহীদের মৌলিক বিষয়ে অক্ষম সাব্যস্ত হবে না।

কেননা তাওহীদ এমন একটি বিষয় আল্লাহ যার জন্য অনেক প্রমাণ পেশ করেছেন। আর এ জাতীয় লোকদের অবস্থা হবে যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল এর ন্যায়। তার নিকট কোন নবী না আসা সত্ত্বেও তিনি একজন একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন। কেননা তিনি তাওহীদের মৌলিক দাবি সমূহ পূর্ণ করেছিলেন এবং ইব্রাহীম (আ:) এর শরীয়াতের অনুসারী ছিলেন। ইবনে ইসহাক বর্ননা করেন, তিনি বলতেন "হে আল্লাহ আমি যদি তোমার

---

[১০] হাকেম বলেন: ইমাম মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ।

ইবাদাতের সর্বোত্তম পদ্ধতি জানতাম তাহলে সে ভাবেই তোমার ইবাদাত করতাম কিন্তু আমি তা জানি না।" [ফাতহুল বারী ইবনে হাজার ২১/২১৮]

শরীয়তের বিস্তারিত বিষয়সমূহ যে গুলো রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যম ছাড়া জানা সম্ভব নয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে ওযর গ্রহণ করা হবে। কেননা সে তো জানেই না সালাত কী জিনিস? যাকাত কী জিনিস? এ কারণে এগুলোর ক্ষেত্রে অক্ষমতা গ্রহণযোগ্য হবে।

কিন্তু তাওহীদের বিষয়টি ব্যতিক্রম। তাওহীদের মৌলিক দাবি পূর্ণ করা ছাড়া মুক্তি নেই। কেননা তাতো বান্দার প্রতি আল্লাহর প্রথম দাবী। আর এ কারণেই তিনি সমস্ত রাসূলকে প্রেরণ করেছেন এবং এর উপর অনেক প্রমাণ পেশ করেছেন, কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কিরামের মত অনুযায়ী: تنجيهم من النار এই উক্তিটি রাসূল (সাঃ) এর নয়। আর কতিপয় মুহাক্কিক আলেমের মতে এই হাদীসটি সহীহ নয়। কেননা হাদীসটির রাবি আবু মুয়াবিয়া খাজেম আজ-জারির ছিল 'মুদাল্লিস' (উস্তাদের নাম গোপনকারী)। আর আ'মাশ ছাড়া অন্যান্যদের থেকে তার বর্ণিত হাদিসগুলো 'যাঈফ' (দুর্বল)। আর এটা সে আ'মাশ ব্যতীত অন্যান্যদের থেকে বর্ননা করেছে, তা ছাড়া সে ছিল কঠোর মুরজিয়া[১১]। যেমনটি ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ও অন্যান্য

---

[১১] মুরজিয়া একটি বাতিল ফেরকা। এদের আক্বীদা সমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

কেবল আল্লাহ এবং রাসূলের মা'রেফাতের (পরিচয়) নামই ঈমান। আমল ঈমানের মূলতত্ত্বের পর্যায়ভূক্ত নয়। ঈমানের সাথে কোন পাপাচার মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। এ চিন্তাধারার কাছাকাছি আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে, ভাল কাজের নির্দেশ এবং খারাপ কাজে নিষেধ এর জন্য যদি অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন দেখা দেয়; তা হলে এটা একটা ফেতনা। সরকারের যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুখ খোলা জায়েয নয়। আল্লামা আবু বকর জাসসাস এ জন্য অত্যন্ত কঠোর ভাষায় অভিযোগ করে বলেন, এসব চিন্তা যালেমের হাত সুদৃঢ় করেছে। অন্যায় এবং ভ্রান্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিরোধ শক্তিকে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মুরজিয়ারা 'আমলের দিক দিয়ে ইসলামকে পঙ্গু করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে প্রকাশ করল যে; সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি ইসলামী আদেশ সংক্রান্ত আমল সমূহের সাথে ঈমানের কোনই সম্পর্ক নেই। এসব কর্মের দ্বারা ঈমান বাড়ে না। অনুরূপ ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া, চুরি ইত্যাদি অন্যায় কাজে ঈমান কমে যায় না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে স্বীকার করার পর কোন গোনাহই মানুষের জন্য ক্ষতিকর

মুহাদ্দিসীনে কেরাম বর্ণনা করেছেন, আর এটা হল ঐ হাদীস যার দ্বারা কঠোর মুরজিয়ারা প্রমাণ পেশ করে থাকে। আর উলামায়ে কিরাম বেদআতীদের এমন বর্ননাকৃত হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্তক করেছেন যা দ্বারা তারা তাদের বেদআতী কাজে সাহায্য গ্রহণ করে। আর এই হাদীস দ্বারা মুরজিয়ারা তাদের মতের পক্ষে সাহায্য গ্রহণ করে, সাথে সাথে এই হাদীসটি 'যয়ীফ' এবং 'মুদাল্লাস' (মুদাল্লিসঃ ঐ হাদীস বর্ণনা কারী যে তার পূর্বের রাবীর নাম গোপন করে।)।

আর উসামা (রাঃ) এর হাদীসটি ("লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সত্ত্বেও তুমি তাকে হত্যা করলে?") ছিল ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে যুদ্ধের ময়দানে ইসলাম গ্রহণ করেছে, আর ইসলামের نواقض (যা ঈমান নষ্ট করে দেয়) থেকে কোন একটি তার থেকে প্রকাশ পায়নি। এই পরিস্থীতিতে তাকে হত্যা করা বৈধ ছিলনা। কেননা লোকটা ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তার থেকে ঈমান বিনষ্টকারী কোন জিনিস প্রকাশ না পাওয়া পযর্ন্ত তাকে হত্যা না করা আবশ্যক ছিল। আর এ কারণেই ইমাম নববী (রহঃ) সহীহ মুসলিমে بـــاب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا اله الا الله (কোন কাফের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করার পর তাকে হত্যা করা হারাম) এই শিরোনামে একটি অধ্যায় এনেছেন। কিন্তু ভালভাবে জেনে রাখা উচিত, সে যদি পরবর্তীতে এই কালিমার উপর অটল না থাকে। এই কালিমার মৌলিক দাবিগুলো পূর্ণ না করে এবং তার نـــواقض (যা ঈমান ধ্বংস করে দেয়) থেকে বিরত না থাকে, তাহলে সে মুসলিম বলে গণ্য হবে না। বরং তাকে হত্যা করা বৈধ হবে। সতরাং উভয় বিষয়ে পার্থক্য অনুধাবন করা উচিত। আর হাদীসে উল্লেখিত ব্যক্তি হত্যা করার পূর্বমূহুর্তে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর তার থেকে কোন نـــواقض

নয়। মুরজিয়ারা এভাবে শরীয়াতের অনুশাসন বাতিল করে ঈমান কেবল মুখে মুখে উচ্চারণ ও মনে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট বলে প্রচার করে। এভাবে এরা ইসলামের বিধিনিষেধ পালনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট শিথিলতা ও সুবিধার আমদানী করল। ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) তাদের (মুরজিয়া) আক্বীদা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ তাদের বিশ্বাস কালেমা শাহাদাত একবার পাঠ করার পর যত প্রকার অন্যায় করুক ঐ অন্যায়ের শাস্তি ভোগের জন্য আদৌ জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে না।

(ঈমান বিনষ্টকারী কোন কথা বা কাজ বা বিশ্বাস) পাওয়া যায়নি। সে তো এমন ব্যক্তি ছিলনা যে বছরের পর বছর নিজেকে মুসলিম দাবি করে আসছে অথচ সে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। আর বিপরীতে তাগুত ও তাগুতের বন্ধুদের সাথে এবং তাগুতের বিধানদাতাদের সাথে বন্ধুত্বের বাধনে আবদ্ধ। কেননা এই ব্যক্তি যদি হাজার বার لا إله إلا الله বলে তাহলেও এই কালিমা তার সামান্য উপকারে আসবে না, যতক্ষণ না সে কুফুর ও শিরক ছেড়ে দেয় এবং যে সব তাগুতের সে অনুসরণ করে, বন্ধুরূপে গ্রহণ করে ও যার রক্ষক হিসাবে নিয়োজিত, সে সব তাগুতের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে। আর এটাই হল কালিমার মূল দাবি। যা আমাদের তাকফীরকৃত ব্যক্তিরা পালন করছে না।

আল্লাহর বানী-

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

"আর যে ব্যক্তি তোমাদেরকে সালাম দেয় তোমরা তাকে বলবে না তুমি মুমিন নও"। [সূরা নিসা: ৯৪]

এই আয়াতের শানে নুযুলঃ হাদীসে আছে, যুদ্ধের সময় একবার সাহাবাগণ (রাযিঃ) একজনকে আক্রমণ করতে গেলে সে ভয়ে তার কাছে যা কিছু ছিল সব সাহাবীদের দিয়ে কালিমা পড়ে ফেলল। সাহাবাগণ (রাযিঃ) তখন লোকটাকে হত্যা করল, তারা ভেবে ছিল লোকটা তাদের ভয়ে কালিমা পড়েছে। আল্লাহ তা'আলা তখন বিষয়টি যে তার অপছন্দনীয় এটা জানিয়ে উক্ত আয়াত নাযিল করেন।

কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে মুসলিম দাবি করে, আর তার মাঝে ইসলামের বিপরীত কোন কিছু না পাওয়া যায় তাহলে তার বাহ্যিক অবস্থার উপর বিচার করা উচিত। কিন্তু যখন প্রকাশ পাবে সে মুসলিম দাবি করে, এর সাথে সাথে অন্য কুফুরিও করে তাহলে তার ইসলাম গ্রহণযোগ্য হবে না। যতক্ষন না সে এই সকল জিনিস থেকে মুক্ত হয় এবং একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দ্বীনকে গ্রহণ করে। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের পুর্বে ও পরে বলেছেন। فتبينوا অর্থাৎ তোমরা অনুসন্ধান কর।

তৃতীয় সংশয়:

তারা তো সালাত কায়েম করে সিয়াম পালন করে।

তারা বলে: এসব সৈন্য এবং সরকারী কর্মচারীদেরকে তোমরা কিভাবে কাফের বল? অথচ তাদের কেউ কেউ সালাত কায়েম করে, সিয়াম পালন করে এবং হজ্জ আদায় করে। আর তারা প্রমাণ স্বরূপ সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস পেশ করে। যাতে জালিম শাসকের আলোচনা করা হয়েছে। কেননা সাহাবায়ে কিরাম বলেছিলেন:

أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ 'আমরা কি তাদের সাথে যুদ্ধ করব না' রাসূল (সাঃ) বললেন,
لَا مَا صَلَّوْا 'না! যতক্ষণ সালাত আদায় করে' [সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমারাহ:৬২-(১৮৫৪)]

আমাদের জবাব: পাঠক পূর্বে জেনেছেন আল্লাহ (সুবঃ) যে দ্বীন দিয়ে সমস্ত নবী রাসূলকে প্রেরণ করেছেন তা হল তাওহীদ, আর এই তাওহীদ সকল আমল এবং ইবাদাত কবুল হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত। সুতরাং এই শর্ত পূরণ করা ব্যতীত আমল কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। সাথে সাথে আরো একটি শর্ত আবশ্যক তা হলো রাসূল (সাঃ) এর অনুসরণ। সুতরাং উভয় শর্ত পাওয়া না গেলে কোন আমলই গ্রহণযোগ্য হবে না।

তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাফেরদের অনেক আমলের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এগুলো তিনি কবুল করবেন না। বরং সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকনায় পরিণত করবেন। কেননা এসব আমলে তাওহীদ ও রাসূল (সাঃ) এর অনুসরণ বিদ্যমান ছিল না। যেমন আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ

অর্থ: 'যারা কফের তাদের আমল মরুভূমির মরীচিকা সাদৃশ্য'। [সূরা নূর: ৩৯]
এমনিভাবে হাদীসে কুদসীতে আছে, মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন: আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন:

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

"আমি সকল শরীকদের থেকে এবং তাদের শিরক থেকে অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি কোন আমলে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি তাকে ও তার শিরককে পরিত্যাগ করি।" [সহীহ মুসলিম : কিতাবুয যুহুদ ওয়ার রকায়েক: ৪৬-(২৯৮৫)]

আর উলামায়ে কিরাম এই হাদীসটিকে ছোট শিরকের ব্যাপারে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। সুতরাং যদি ছোট শিরকের উপর এতবড় ধমকি আসে তাহলে বড় শিরকের পরিণাম কত ভয়াবহ হবে।

আর নিঃসন্দেহ সালাত, সিয়াম ও হজ্জ সহীহ হওয়া এবং আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম শর্ত তাওহীদ।

ইসলামে প্রবেশের একমাত্র মাধ্যম হল তাওহীদের কালিমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তাওহীদের স্বীকারোক্তি ব্যতীত অন্য কোন ইবাদাত যথাঃ সালাত, সিয়াম ইত্যাদি দ্বারা ইসলামে প্রবেশ সম্ভব না। কিন্তু আলেমগণ সালাত আদায়কারীকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করে থাকেন এই জন্য যে, সালাত তাওহীদেরই অন্তর্ভূক্ত একটি ইবাদাত। স্বাভাবিক ভাবে তাওহীদে বিশ্বাসীরাই সালাত আদায় করে থাকেন। কেননা তাওহীদই সালাত সহীহ ও কবুল হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত।

যে ব্যক্তি তাওহীদের মৌলিক দুটি বিষয় (১) তাগুতকে অস্বীকার (২) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে বাস্তবায়ন করা ব্যতীত তার কোন আমল ও ইবাদাত গ্রহণযোগ্য হবে না।

যে ব্যক্তি তাগুতের আনুগত্য পরিত্যাগ করবে না এবং তাগুতকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবে না, বরং প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত থাকবে আবার সালাতও আদায় করবে। তাহলে তার সালাত গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তাকে মুসলমান বলা যাবে না। আর এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ হল মহান আল্লাহর বাণী :

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ:- 'তুমি যদি শিরক কর, তবে তোমার সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে'।[সূরা যুমার : ৬৫]

এমনিভাবে আল্লাহ (সুবঃ) অপর আয়াতে বলেন:

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"তারা যদি শিরক করত তাহলে তাদের সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হয়ে যেত"। [সূরা আনআম: ৮৮]

তাই আল্লাহ (সুবঃ) এর সাথে শিরক পরিত্যাগ করা অর্থাৎ তাগুতের আনুগত্য করা থেকে বিরত থাকা, এবং আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগীতা না করা, আমল কবুল হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম শর্ত। আর এটাই আল্লাহ (সুবঃ) সর্বপ্রথম তার বান্দাদের প্রতি ফরয করেছেন। ইহা ব্যতীত সকল আমল অনর্থক।

অথচ এসব সৈন্যরা তাগুতকে অস্বীকার করার পরিবর্তে তাদেরকে সাহায্য করে এবং তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তাদের কুফরী আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের পৃষ্ঠপোষকতা করে। সুতরাং তাদের সালাত, সিয়াম ও অন্য সকল নেক আমল গ্রহণযোগ্য হবে না। যতক্ষণ তারা এগুলো কবুল হওয়ার যেসব শর্ত আছে তা পূর্ণ না করবে। আপনি যদি দেখেন যে, কেউ অজু ছাড়া সালাত আদায় করছে তাহলে তার সালাত আপনার দৃষ্টিতে কি গ্রহণীয় হবে? না তার মুখে ছুড়ে মারা হবে? এ ব্যাপারে হয়তো কোন ব্যক্তিই দ্বিমত পোষণ করবে না যে, তার সালাত কবুল হবে না।

তাহলে হে আল্লাহর বান্দা! আপনি একটু চিন্তা করুন! সালাত সহীহ হওয়ার জন্য পবিত্রতা শর্ত। তাই পবিত্রতা ছেড়ে দেওয়ার কারণে তার সালাত বাতিল হচ্ছে। তাহলে আমল কবুলের প্রধান শর্ত তাওহীদ ও তাগুতের অস্বীকার ছেড়ে দেওয়ার দ্বারা তার সালাত কিভাবে কবুল হতে পারে? আর তাই আল্লাহ (সুবঃ) আদম সন্তানদের উপর সালাতও তার শর্ত সমূহ শিক্ষা করার পূর্বে তাওহীদ শিক্ষা করা এবং তদানুযায়ী আমল করা ফরয করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের উপর সর্বপ্রথম মক্কায় তাওহীদ ফরয হয়েছিল। সবার জানা আছে সাহাবায়ে কিরাম মক্কায় নির্যাতিত হয়েছেন, বিপদগ্রস্ত হয়েছেন, কষ্ট সহ্য, করেছেন, বাধ্য হয়ে শেষে হিজরত করেছেন, শুধুমাত্র তাওহীদের জন্য। সালাত, যাকাত বা অন্য কোন ফরয ইবাদতের জন্য তাদের সম্প্রদায় তাদেরকে নির্যাতন করেনি। বরং সেগুলো তখন ফরযই হয়নি। তাদেরকে সর্বপ্রথম তাওহীদের দাবি পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। কেননা অন্যান্য ইবাদাত তাওহীদ ছাড়া গ্রহণযোগ্যই হবে না।

তাই রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম সর্বপ্রথম মানুষদেরকে তাওহীদকে গ্রহণ ও তাগুতকে বর্জনের দিকেই আহ্বান করেছেন। আল্লাহর শপথ! তারা তাওহীদের দিকে আহ্বানের পূর্বে মানুষদেরকে সালাত, সিয়াম বা অন্যান্য বিধানের দিকে আহ্বান করেননি।

আপনি মু'আজ বিন জাবাল (রাযিঃ) সম্পর্কে সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত হাদীসটি পাঠ করুন। যে হাদীসে রাসূল (সাঃ) তাঁকে ইয়ামেনে পাঠানোর সময় দাওয়াতের নিয়ম ও পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ

أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

"তুমি আহলে কিতাবের একটি সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সর্বপ্রথম তুমি তাদেরকে আল্লাহর এককত্বের দিকে আহ্বান করবে। যদি তারা আল্লাহর এককত্বকে মেনে নেয় তাহলে তুমি তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ (সুবঃ) তাদের উপর দৈনিক পাঁচবার সালাত ফরয করেছেন। তারা যদি সালাত আদায় করে তখন তুমি তাদেরকে জানাবে আল্লাহ (সুবঃ) তাদের মালের উপর যাকাত ফরয করেছেন যা তাদের ধনীদের থেকে নিয়ে গরীবদেরকে দেয়া হবে।" [সহীহ বুখারীঃ ৭৩৭২]

সুতরাং আবশ্যক হল মানুষদেরকে সর্বপ্রথম তাওহীদের মাধ্যমে ইসলামের দিকে আহ্বান করা। সালাতের মাধ্যমে নয়। তারা যদি তাওহীদকে স্বীকার করে তাহলে সালাত, যাকাত ও অন্যান্য বিধানের দিকে আহ্বান করা হবে। যে তাওহীদকে গ্রহণ করল তার থেকে সালাত ও অন্যান্য ইবাদাত গ্রহণ করা হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাওহীদ ব্যতিরেকে ইসলামের অন্যান্য বিধান আকড়ে ধরল তার কোন আমল গ্রহণ করা হবে না।

কেননা আল্লাহ (সুবঃ) শুধুমাত্র তাওহীদের এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তা এমন হাতল যা ছিন্ন হবার নয়। আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا

অর্থঃ 'দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়েত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। [সূরা বাক্বারাঃ ২৫৬]

আর এ কারণেই অনেককে বাহ্যিকভাবে অনেক ইবাদাত করতে দেখা যায়, কিন্তু কিয়ামতের দ্বীন তার ইবাদাত তার মুখে ছুড়ে মারা হবে আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (٢) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (٣)

অর্থ: 'সেদিন অনেক চেহারা হবে অবনত। কর্মক্লান্ত, পরিশ্রান্ত'। [সূরা গাশিয়া: ২,৩]

অতঃপর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম:

تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً

অর্থ: 'তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে'। [সূরা গাশিয়া: ৪]

সকল ইবাদাত ও সৎ কাজ সব বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিনত হবে। কেননা সে একনিষ্ঠ মুসলিম ছিল না।

জালিম শাসক সম্পর্কে হাদীসটির ব্যাখ্যা: রাসূল (সাঃ) জালিম শাসকদের সাথে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ তারা আমাদের মাঝে সালাত প্রতিষ্ঠা করে। উক্ত হাদীসে তাওহীদ ব্যাতিরেকে শুধু সালাত উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে ইঙ্গিত হল সালাতের সাথে সাথে তাওহীদকেও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর দলিল হল অন্যান্য হাদীস। যা এই হাদীসের ব্যাখ্যাকারী যেগুলোতে সালাত ও যাকাতের পূর্বে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। যেমন বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে উল্লেখিত, একটি হাদীসে এসেছে:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

অর্থ: 'আমাকে ক্বিতালের (যুদ্ধের) আদেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না মানুষ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। অতঃপর সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। তারা যখন এগুলো করবে তখন আমার থেকে তাদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু অন্য কোন হক্বের (কাউকে হত্যা করলে তাকেও হত্যা করা হবে, বিবাহিত হওয়া সত্ত্বে জিনা করলে রযম করা হবে) কারণে। এবং তাদের (অন্তরের) হিসাব হবে আল্লাহর নিকট। [সহীহুল বুখারী :২৫; সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান :৩৬-(২২)]

লক্ষ্য করুন! উক্ত হাদীসে ক্বিতালের সর্বপ্রথম মাপকাঠি বানানো হয়েছে তাওহীদকে। আর অন্য হাদীসে যে সালাতের কথা বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হল সালাত হতে হবে তাওহীদের সাথে। কেননা তাওহীদ ব্যতীত সালাতের কোন মূল্য নেই। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

অর্থঃ 'অবশ্য যদি তারা তওবা করে ও সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তাহলে তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দিবে'। [সূরা তওবাঃ ৫]

فَإِنْ تَابُوا অর্থাৎ যদি তারা শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে। এবং গাইরুল্লাহর ইবাদাত ছেড়ে দেয় ও তাওহীদ গ্রহণ করে। অতঃপর সালাত আদায় করে এবং যাকাত দেয় তাহলে তাদের জান ও মাল রক্ষা পাবে।

কিন্তু কুফর ও শিরক থেকে তওবা না করে বা তাওহীদে বিশ্বাসী না হয়ে সালাত কায়েম করলে তা মুসল্লির কোন কাজেই আসবে না। রাসূল (সাঃ) এর জামানায় অনেক ঈমানদার শুধু একটি কথার কারণে কাফের ও মুরতাদ হয়ে গেছে।

তার একটি দৃষ্টান্ত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যে সব ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর সাথে 'গাযওয়ায়ে তাবুক' এর মধ্যে অংশগ্রহণ করেছিল। তারা সালাত আদায় করত তথাপি তাওহীদ বিনষ্টকারী বিষয় সমূহ হতে একটি বিষয় পাওয়া যাওয়ার কারণে তারা কাফের হয়ে গিয়েছে। আর তা হলো কুরআন পাঠকারীদের ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা। আল্লাহ (সুবঃ) তাদের সম্পর্কে বলেনঃ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ অর্থঃ 'অজুহাত দেখাবে না তোমরা ঈমান আনার পর কুফরী করেছ'। [সূরা তওবাঃ ৬৬]

এ জন্যই ফিক্হের কিতাবে حكم المرتد (মুরতাদের বিধান) সম্পৃক্ত একটি অধ্যায় থাকে।

ফিক্হের কিতাবে মুরতাদের সংজ্ঞা বলা হয়েছেঃ 'মুরতাদ হল ঐ ব্যক্তি যে ইসলাম গ্রহণের পর কোন কথা, কাজ বা বিশ্বাসের কারণে কাফের হয়ে যায়। এ কারণেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) ইয়াসিক (তাতারী কর্তৃক প্রণিত একটি সংবিধান) এর অনুসারীদের কাফের বলে ফতওয়া দিয়েছেন। যেমন তিনি তাদের সাহায্যকারী ও সৈনিকদের কাফের ফাতওয়া দিয়েছেন। [আল মুজাল্লাদ]

এসব বিধানদাতাদের সহযোগীরা প্রকাশ্য শিরকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তাগুত ও বিধানদাতাদেরকে মুওয়াহ্হিদদের বিরুদ্ধে সাহায্য করে। আর এটা ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার অন্যতম একটি কারণ। সুতরাং প্রকাশ্য সালাত আদায় কোন কাজেই আসবে না এবং কোন উপকার করবে না যতক্ষণ তাদের মাঝে এই কারণ বিদ্যমান থাকে।

চতুর্থ সংশয়:

যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে তাকফীর করে সে কুফরী করে।

তারা বলে: 'তাকফীর' একটি স্পর্শকাতর বিষয়, কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন: من كفر مسلما فقد كفـــر অর্থ: "যে কোন মুসলিম কে "তাকফীর" করল সে কুফরী করল" বরং তাদের মধ্যকার কিছু মূর্খ লোক বলে, যে ব্যক্তি কাফের পিতা-মাতার গর্ভে জন্ম নিয়েছে, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে "তাকফীর" করা বৈধ নয়।

আমাদের জবাব: সব ধরণের "তাকফীর" ভয়ানক ও দোষনীয় নয়। তবে শরয়ী প্রমাণ ব্যতীত, শুধু মাত্র গোড়ামি ও কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে কোন মুসলিমকে "তাকফীর" করা ভয়ানক বিষয়। যেমনিভাবে সকল বিশ্বাস প্রশংসনীয় নয়, তেমনিভাবে সকল অবিশ্বাসও দোষনীয় নয়।

যে বিষয়ে বিশ্বাস রাখা আবশ্যক তা হল "আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস" আর যে বিষয়ে বিশ্বাস রাখা নিষিদ্ধ ও শিরক তা হল তাগুতের প্রতি বিশ্বাস। তেমন ভাবে যে বিষয়ে অবিশ্বাস রাখা আবশ্যক ও প্রশংসনীয় তা হল তাগুতের প্রতি অবিশ্বাস। আর যে বিষয় অবিশ্বাস করা নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয় তা হল আল্লাহ তা'আলা ও তার দ্বীন এবং তার আয়াত সমূহের প্রতি অবিশ্বাস।

সুতরাং যেমনিভাবে কোন মুসলিমকে শরয়ী দলীল ব্যতীত "তাকফীর" করা ভয়ানক বিষয়, তেমনিভাবে কোন মুশরিক বা কাফেরকে মুসলিম বলে ঘোষনা করা এবং তার সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব রাখাও ভয়ানক বিষয় ও ফিতনার কারণ। যেমন আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

অর্থ: "আর যারা কুফরী করে, তারা একে অপরের বন্ধু। যদি তোমরা তা না কর, (মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব ও কাফেরদের সাথে শত্রুতা) তাহলে জমিনে ফিতনা ও বড় ফাসাদ হবে।" [সূরা আনফাল: ৭৩]

আর উপরোক্ত হাদীসটি যে শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে সে শব্দে রাসূল (সাঃ) থেকে কোন হাদীস বর্ণিত নেই। কেননা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে কোন মুসলিমকে কাফের বলবে সে কাফের হয়ে যাবে, এমনটি নয়। বিশেষ ভাবে যাকে তাকফীর করা হয়েছে সে যদি এমন কাজ করে, যাকে আল্লাহ তা'আলা

ও তার রাসূল (সাঃ) কুফর বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর যে বলে মুসলিম কখনো কাফের হয় না তার একথা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা লোক দেখানো মুসলিমদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

এক.

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

অর্থ: "তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ।" [সূরা তাওবা: ৬৬]

দুই.

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ

অর্থ: "নিশ্চয় যারা হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক মুখ ফিরিয়ে নেয় (মুরতাদ হয়ে যায়), শয়তান তাদের কাজকে চমৎকৃত করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দিয়ে থাকে।"[সূরা মুহাম্মদ: ২৫]

তিন.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে ফিরে যায় তাহলে অচিরেই আল্লাহ এমন কওমকে আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুমিনদের উপর বিনম্র এবং কাফিরদের উপর কঠোর হবে। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে এবং কোন কটাক্ষকারীর কটাক্ষকে ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" [সূরা মায়েদা: ৫৪] এধরণের আরো অনেক আয়াত আছে।

যদি কোন মুসলমান কুফরীর কারণে মুরতাদ না হয়, তাহলে ইসলামী ফিক্হের কিতাব সমূহে মুরতাদের বিধান কেন বর্ণনা করা হয়েছে? হাদীসে আছে: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ অর্থ: "যে ধর্ম (ইসলাম) পরিত্যাগ করে তাকে তোমরা হত্যা কর।"[সহীহ বুখারী: ৩০১৭, ৬৯২২, ৭৩৬৮, সুনানে আবু দাউদ: ৪৩৫৩]

আর পূর্বের হাদীসের মূল শব্দ হল:

أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ

অর্থ: "যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইকে বলল হে কাফের! তাহলে এটা দুইজনের একজনের উপর বর্তাবে। যাকে বলা হয়েছে সে যদি এমনটিই হয় তাহলে তো হল, অন্যথায় এটা যে বলেছে তার দিকেই ফিরে আসবে।"[সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান :১১১-(৬০)]

সতরাং রাসূল (সাঃ) এর বানী إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ অর্থাৎ 'সে যদি তার কথানুযায়ী হয়' প্রমাণ বহন করে, যে মুসলিমের মাঝে কুফরী প্রকাশ পায়, আর তার মধ্যে তাকফীর কে নিষেধকারী অন্য কোন জিনিস পাওয়া না যায়, তাহলে তাকে 'তাকফীর" করা বৈধ।

কোন ব্যক্তি বড় কুফর করলেই কাফের হয়ে যায় না। বরং তার সাথে শর্তযুক্ত হল তার মাঝে কুফর প্রতিরোধকারী অন্য কোন কারণ বিদ্যমান না থাকা। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি কুফরী কাজে লিপ্ত থাকার কারণে তাকে তাকফীর করা হয় । অতঃপর প্রকাশ পায় তার মাঝে তাকফীর প্রতিহতকারী অপর কোন কারণ বিদ্যমান ছিল। তাহলে এই কুফর তাকফীরকারী ব্যক্তির দিকে ফিরে আসবে না। কেননা এ ব্যাপারে সে অজ্ঞ ছিল।

যেমনটি ঘটেছিল উমর (রাঃ) এর ব্যাপারে কেননা তিনি হতেব (রাযিঃ) এর ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) কে বলেছিল: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ "হে রাসূলুল্লাহ আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। [সহীহ বুখারী:৪২৭৪]

রাসূল (সাঃ) বললেন, হাতেব আবু বালতা (রাঃ) কাফের হয়নি। তিনি উমর (রাঃ) কে একথা বলেননি যে, তুমি কাফের হয়ে গেছ, কেননা তুমি একজন মুসলমানকে মুনাফিক বলেছ এবং তাকে হত্যা করা বৈধ্য ভেবেছ। আর যে মুসলিমকে তাকফীর করে তাহলে সেও কাফের হয়ে যায়। যেমন তারা ধারণা করে।

ইবনে কাইয়্যূম (রহঃ) তার কিতাব যাদুল মা'আদ এর মধ্যে এই অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

সুতরাং বুঝা গেল কোন মুসলিমকে কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় বা গোঁড়ামি করে তাকফীর করা নিন্দনীয়। আর উলামায়ে কেরাম উল্লেখিত হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন:

(এক) কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ও তাওহীদ কে কুফর বলে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

(দুই) কেউ যদি মুসলিমদের তাকফীর করাকে সহজ, ও স্বাভাবিক ভাবে, তাহলে সে এই হাদীসের উদ্দেশ্য হবে। এ ধরণের আরো অন্যান্য ব্যাখ্যা রয়েছে।

ইমাম নববী (রহঃ) “শরহে সহীহ মুসলিমে এ ধরণের আরো কয়েকটি দিক উল্লেখ করেছেন, উলামায়ে কেরাম এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেননি। বরং অন্য অর্থ গ্রহণ করেছেন। কেননা এর বাহ্যিক অর্থ “ঈমান ও কুফর” এর অধ্যায়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহের মূলনীতির বিপরীত। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

অর্থ: “নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শরীক করাকে এবং এ ছাড়া যাকে চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো ঘোর পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হল।” [সূরা নিসা :১১৬]

আর এটা স্পষ্ট যে কোন মুসলিমকে কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে অথবা কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় গালি দেয়া এবং কাফের বলা এমন শিরক নয় যা মুসলিমকে ইসলাম থেকে খারেজ করে দেয়। এ কারণেই উক্ত হাদীসকে অন্য “নসের” সাথে মিলানো হয়েছে এবং তার আলোকে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আর যদি বলা হয় এই হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ ব্যক্তি যে মুসলিমদের তাকফীর করে; তাদের সাথে ও তাদের তাওহীদের সাথে শত্রুতাবশতঃ এবং তারা তাগুতকে বর্জন করার করণে। আর একারণে তাদেরকে খাওয়ারেজ বলে এবং তাদের শত্রুদেরকে সাহায্য করে।

তাহলে এই হাদীসের অন্য অর্থ নেয়ার প্রয়োজন হবে না। কেননা এটা নিঃসন্দেহ কুফরী।

আর ঐ মূর্খ লোকের কথা, যে বলেছিল শুধুমাত্র কাফের পিতা-মাতার গর্ভে জন্ম নিলেই তাকে কাফের বলা যাবে। তার এই মত একেবারে অগ্রহণযোগ্য। আর তার কথা এটা প্রমাণ করে যে, সে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। কেননা এর অর্থ হয় মুসলিম কখনো কাফের হয় না। আর এ ব্যাপারে মুতাকাদ্দিমীনদের মধ্য থেকে কোন আলেম তো দূরের কথা কোন জাহেলও বলেনি।

পঞ্চম সংশয়:

তারা তো দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ।

তারা বলে: এসব সৈন্যরা অজ্ঞ। তাদের প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের যারা তাদেরকে শিক্ষা দিবে, সৎপথে আহ্বান করবে এবং সকল বিষয় তাদের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরবে। তারাতো জানে না তাদের প্রধানরা তাগুত। আর আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা করা কুফরী। তাই তারা কাফের হবে না।

আমাদের জবাব: হ্যাঁ! এই সমস্ত সৈন্য এবং অন্যান্যদের দাওয়াত দেয়া অবশ্যই প্রয়োজন। যেমন আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ: 'তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং বলে আমি একজন মুসলমান'। [সূরা হা'মীম সাজদা: ৩৩] কিন্তু আল্লাহর ইবাদতের সাথে সাথে এ ব্যক্তিকে অবশ্যই শিরক ত্যাগ করতে হবে। অন্যথা সে মুশরিক বলেই বিবেচিত হবে। চাই তার কাছে দাওয়াত পৌছানো হোক বা না হোক। দাওয়াত না পৌছার কারণে তাকে মুসলিম বলা যাবে না। যেমন আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থ: 'আর মুশরিকদের মধ্য থেকে কেউ যদি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করে তাহলে তুমি তাকে আশ্রয় দাও। যাতে করে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পারে। অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌছে দাও। কারণ তারা অজ্ঞ'। [সূরা তাওবা: ৬]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাদেরকে তার কালাম শুনার পূর্বেই মুশরিক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অথচ তারা অজ্ঞ ছিল। আল্লাহ তার রাসূল (সাঃ) কে তাদের দাওয়াত প্রদানের এবং ভাল কথা শুনানোর আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এ আদেশ সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে মুশরিক বলেছেন। যতক্ষণ তারা শিরককে আকড়ে ধরেছিল। কেননা শিরকে আকবার এমন যে, এই শিরককারীর অজ্ঞতার অজুহাত কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মহান রাব্বুল আলামীন তার একত্বতার নিদর্শন সমগ্র সৃষ্টিতে রেখেছেন। তাদের মধ্য হতে উলামায়ে কিরাম কয়েকটির কথা উল্লেখ করেন।

এক. আল্লাহর এককত্বের উপর প্রকাশ্য জাগতিক প্রমাণ সমূহ।

আল্লাহ (সাঃ) এর রুবুবিয়্যাত তার ওয়াহদানিয়্যাতের উপর প্রমাণ বহন করে। কেননা যিনি সৃষ্টি করেছেন, রিযিক দিচ্ছেন, আকৃতি দিয়েছেন এবং সবকিছু পরিচালনা করছেন। তিনি এমন এক সত্তা যিনি একমাত্র ইবাদাত এবং বিধান দানের যোগ্য। আর এ ব্যাপারে কাউকে তার অংশীদার ও সমকক্ষ ভাবা শরীয়াত ও বিবেক উভয়েরই বিরুদ্ধ।

দুই. আল্লাহ (সুবঃ) যখন মানুষকে তাদের আদি পিতা আদম (আঃ) এর পিঠ থেকে বের করেছেন তখন তিনি তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

অর্থঃ 'আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব বনী-আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজদের উপর সাক্ষী করলেন যে, 'আমি কি তোমাদের রব নই'? তারা বলল, 'হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।' যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পার যে, নিশ্চয় আমরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম'। [সূরা আ'রাফঃ ১৭২]

তাই স্পষ্ট শিরকের ক্ষেত্রে তাদের অসতর্কতা, অজ্ঞতা ও তাকলিদ (পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুসরণ) অজুহাত হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা আল্লাহ (সুবঃ) পূর্বেই তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন 'তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে রব হিসাবে গ্রহণ করবে না'।

তিন. আল্লাহ (সুবঃ) মনুষকে জন্মগত ভাবে যে স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার দাবি হল, সৃষ্টিকর্তা একজন এবং তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত ও বিধানদাতা। যেমন হাদীসে এসেছেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ [صحيح البخاري]

অর্থঃ 'আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক সন্তানই স্বভাবজাত (ইসলাম) ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী বানায় অথবা খৃষ্টান বানায় অথবা মূর্তিপূজক বানায়'। [সহীহুল বুখারীঃ ১৩৮৫] অপর এক বর্ণনায় এসছে "মুশরিক বানায়"। [সুনানে তিরমিযীঃ২১৩৮; সনদঃসহীহ]

এমনিভাবে মুসলিমে হাদীসে কুদসীতে এসেছে।

إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا

অর্থ: 'আমি আমার সকল বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ অবস্থায় সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের নিকট শয়তান আসে এবং তাদেরকে দ্বীন থেকে সরিয়ে দেয় ও আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছি তা সে হারাম করে। আর তাদেরকে আদেশ দেয়, যাতে তারা আমার সাথে এমন জিনিসের শিরক করে যার কোন প্রমাণ আমি অবতীর্ণ করিনি। [সহীহ মুসলিম: কিতাবুল জান্নাতি ওয়া নায়ীমিহা ওয়া আহলিহা :৬৩-(২৮৬৫)]

চার. আল্লাহ (সুবঃ) সকল নবী রাসূলকে এই মহান উদ্দেশ্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থ: 'নিশ্চয় আমি সকল জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগুতকে পরিহার কর'। [সূরা নাহাল: ৩৬]

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

অর্থ: 'এসকল রাসূল এমন যাদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠানো হয়েছিল। যাতে রাসলগণের আগমনের পর আল্লাহর সামনে মানুষের কোন অজুহাত বাকি না থাকে'। [সূরা নিসা: ১৬৫]

আর যদি কোন ব্যক্তি পর্যন্ত রাসূল নাও পৌঁছে তথাপি সে অন্য কারো কাছ থেকে শুনে থাকবে। কেননা যদিও রাসূলদের শরীয়তের ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু তাওহীদ ও শিরকের ব্যাপারে তাদের আহ্বান এক ও অভিন্ন। আর আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

অর্থ: 'আমি রাসূল পাঠানোর পূর্বে কাউকে শাস্তি দেই না'। [সূরা বনী ইসরাঈল : ১৫]

সুতরাং আল্লাহ (সুবঃ) সকল মানুষের নিকট তাঁর রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। এবং মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে সে ধারাটি পূর্ণতা লাভ করেছে। তাই তারপর আর কোন রসূল নেই।

পাঁচ. আল্লাহ ধারাবাহিকভাবে অনেক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যা এই তাওহীদের দিকেই আহ্বান করে।

আর এই ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন এমন এক কিতাব দিয়ে যা কখনো বিকৃত হবে না। আল্লাহ (সুবঃ) নিজেই কিয়ামত পর্যন্ত এর সংরক্ষণের জিম্মাদার হয়েছেন এবং এতে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে মানুষদেরকে

সতর্ক করেছেন। এ সব বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাওহীদ। আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ

অর্থঃ 'আমার প্রতি ওহীরূপে এই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করি এবং যাদের নিকট এ কুরআন পৌঁছবে তাদেরকে'। [সূরা আনআমঃ ১৯] তিনি আরও বলেনঃ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

অর্থঃ 'মুশরিকরা ও কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত নিবৃত হওয়ার ছিলনা, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসে'। [সূরা বায়্যিনাহঃ ১] অতপর তিনি আয়াতে বর্ণিত প্রমাণের পরিচয় দিয়ে বলেন।

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً

অর্থঃ 'আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল, যে পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করে শোনাবে'। [সূরা বায়্যিনাহঃ ২]

সুতরাং যার নিকট এই কুরআন পৌঁছবে তার অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। বিশেষ করে দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাওহীদের ব্যাপারে, যার জন্য তিনি সকল নবী রাসূলদের পাঠিয়েছেন। কেননা আল্লাহ (সুবঃ) মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ

অর্থঃ 'তাদের কি হল যে, তারা উপদেশ বাণী থেকে বিমূখ'। [সূরা মুদ্দাছ্ছিরঃ ৪৯]

রাসূল (সাঃ) এর জীবন থেকে জানা যায়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে তার দাওয়াতের নিয়ম ছিল, তিনি গোত্র প্রধানদের নিকট চিঠি পাঠাতেন। সাধারণ লোকদের নিকট কোন পয়গাম পাঠাতেন না। এবং দূতদের এই আদেশও দিতেন না যে, তারা যেন সকল জনগণের নিকট এই দাওয়াত পৌছায়। অতঃপর গোত্রপ্রধান যদি এই দাওয়াত কবুল না করত তাহলে তিনি তাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। সাহাবায়ে কিরামের দাওয়াতের পদ্ধতিও এই ছিল। তাহলে সেখানে তো সাধারণ লোকদের অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণযোগ্য হয়নি।

আর বর্তমান তাগুতরা এবং তাদের সাহায্যকারী সৈন্যরা মুশরিকদের দিকনির্দেশনা গ্রহণ করে, তাওহীদ সম্বলিত কুরআনের আয়াতের বিরুদ্ধাচারণ করে। আর তারা সত্য শ্রবণ করা থেকে পলায়ন করে। যেমন জঙ্গলী গাধা সিংহ দেখলে দৌড়ে পালায়। তারা কিতাবুল্লাহকে প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে এই অজ্ঞতা নিজেরাই গ্রহণ করেছে। অথচ স্পষ্ট প্রমাণ তাদের সামনে ছিল। তাদের এই অজ্ঞতা তাদের নিকট রিসালাত না পৌছার কারণে অথবা

নির্বুদ্ধিতা, পাগলামি ইত্যাদির কারণে নয়। উপরন্তু তারা শরীয়াত কায়েমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও বাধা প্রদান করে। আর এটা নিশ্চিত বিষয়, যে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তার অজ্ঞতার অজুহাত কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু এই সমস্ত তর্ককারীরা দ্বীনের বিরুদ্ধাচারীদের পক্ষাবলম্বন করে বলে থাকে:- তারা (শাসকেরা) যেহেতু অজ্ঞ তাই তারা কাফের হবে না। অথচ আল্লাহ (সুবঃ) বলেন: قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ "(হে নবী! তাদেরকে) বল, এমন প্রমাণ তো আল্লাহরই আছে, যা (অন্তরে) পৌছে যায়। [সূরা আনআম: ১৪৯] আর এ কারণেই নবী করীম (সাঃ) কে এক ব্যক্তি নিজ পিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ "নিশ্চয় আমার ও তোমরা পিতা জাহান্নামী"। [সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান :২০৩-(৩৪৭)]

অথচ তারা ছিল এমন সম্প্রদায় যাদের ব্যাপারে মহান রাব্বুল আলামীন বলেন,

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ

অর্থ: 'যাতে তুমি এমন এক কওমকে সতর্ক কর, যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, কাজেই তারা উদাসীন।' [সূরা ইয়াসীন: ৬]

এটা এ কারণে যে, মৌলিক তাওহীদ এবং শিরকে আকবার ও গাইরুল্লাহর ইবাদাত যে যুক্তিযুক্ত না আল্লাহ (সুবঃ) তার দলিল ও নিদর্শন বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। (যেমনটি পূর্বে উল্লেখ হয়েছে)

এতদাসত্ত্বেও এমন কিছু লোক আছে যারা নামমাত্র মুসলমান এবং ইসলামকে প্রথা হিসেবে পালন করে। তারা স্পষ্ট শিরক ও তাওহীদের ব্যাপারে প্রমাণ তালাশ করে!

অথচ এই তাওহীদই হল বান্দার কাছে আল্লাহর প্রথম চাওয়া। যে কারণে তিনি সমস্ত রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, আসমানী কিতাব সমূহ অবতীর্ন করেছেন, আরো অনেক প্রমাণ পেশ করেছেন।

তারা অধিকাংশ সময় একটি আয়াতের ভিত্তিতে শাসক ও সৈন্যদের পক্ষাবলম্বন করে থাকে যদিও আয়াতটি ভিন্ন বিষয়ে অবতীর্ন।

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

অর্থ: 'আমি রাসূল পাঠানোর পূর্বে কাউকে শাস্তি দেই না'। [সূরা বনী ইসরাঈল : ১৫]

এর প্রেক্ষিতে তারা বলে, অজ্ঞতা দূর হওয়ার পূর্বে তাকফীর করা যাবে না। অথচ এই আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয়। আল্লাহ (সুবঃ) এখানে বলেননি 'আমি তোমাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করব না যতক্ষণ রাসূল প্রেরণ না করি'। বরং তিনি বলেছেন, مُعَذِّبِينَ "শাস্তি দিব না"। আর শাস্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হল হয়তো পার্থিব শাস্তি। যেমন আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا

অর্থঃ 'তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি জনপদ সমূহকে ধ্বংস করে দিবেন যতক্ষণ না তিনি তার মূল ভূখণ্ডে রাসূল প্রেরণ করেন, যে তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে'। [সূরা কাসাস: ৫৯]

অথবা উদ্দেশ্য হবে আখেরাতের শাস্তি যেমন আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন:

{كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (٨) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ

অর্থঃ 'যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তার প্রহরীরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি'? তারা বলবে, 'হ্যাঁ, আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল'। [সূরা মূলক: ৮, ৯]

সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা তাদেরকে শিরকে আকবার ও গাইরুল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে তাকফীর না করা উদ্দেশ্য না।

কেননা কাফের দুই ধরণের। (১) সে কুফরী করে একগুয়েমী ও অবাধ্যতাবশতঃঃ যেমন অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা সত্যকে বুঝতে পারা সত্যেও অস্বীকার করেছে। (২) যে কুফরী করে অজ্ঞতা বশত: অন্যের দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে। যেমন খ্রিষ্টানরা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের আলেমদের ধর্ম-বিকৃতির কারণে।

এমনটা নয় যে, প্রত্যেক কাফের সত্যকে পরিপূর্ণ জেনে অস্বীকার করে। বরং তাদের অধিকাংশ এমন যারা অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির শিকার। তথাপি কুফরের দরুন তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। কেননা তারা তাদের নেতা, শাসক ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ করেছে। অথচ তাদের ধারণা ছিল তারা সৎপথে আছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শিরকে আকবার থেকে বেঁচে থাকার জন্য বাহ্যিক ভাবে অনেক প্রমাণ পেশ করেন। তাই এ ব্যাপারে অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তার এই অজ্ঞতা দ্বীন ও ইলম থেকে বিমুখ থাকার কারণে। একারণে নয় যে, তার সামনে কোন প্রমাণ নেই।

উদাহরণ স্বরূপ: যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল এর ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে, তিনি ছিলেন ইসলামের পূর্বের যামানার লোক যাদের ব্যাপারে আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন:

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ

অর্থঃ 'যাতে তুমি এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন ওহী আসেনি'। [সূরা কাসাস: ৪৬]

বর্ণিত আছে নবী প্রেরিত না হওয়া সত্ত্বেও তিনি মুওয়াহ্হিদ ছিলেন। তিনি একনিষ্টভাবে ইব্রাহিম (আ:) এর মিল্লাতের উপর ছিলেন। স্বভাবগতভাবে

তিনি তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন। স্বীয় গোত্রের তাগুতদের কে বর্জন করেছিলেন এবং তাদের সাহায্য ও উপাসনা থেকে নিজেকে পবিত্র রেখেছিলেন। আর এটা তার নাজাতের জন্য যথেষ্ট ছিল। রাসূল (সাঃ) বলেনঃ তাকে একাই এক উম্মত হিসাবে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে। রাসূল (সাঃ) নবুওতের পূর্বে যখন তার সাথে সাক্ষাত করেন তখন তাঁর সামনে দস্তরখানে গোস্ত পেশ করা হল। তিনি তা খেতে অস্বীকৃত জানালেন। তখন যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল বললেন, তোমরা প্রতিমার নামে যে প্রাণী যবেহ কর তা আমি খাই না। আর তিনি কুরাইশদের প্রতিমার নামে যবেহ কে নিন্দা করতেন। বলতেন "আল্লাহ (সুবঃ) ছাগল সৃষ্টি করেছেন অতঃপর আসমান থেকে তার জন্য পানি বর্ষণ করেছেন এবং জমিন থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছেন। আর তোমরা এই বিষয়গুলো অস্বীকার করে গাইরুল্লাহর সম্মানার্থে এই প্রাণী যবেহ করছ? [সহীহ বুখারীঃ ৩৮২৬, ৫৪৯৯, কানযুল উম্মালঃ ৩৭৮৬৩, জামেউল আহাদীসঃ ৩৫১৪৩]

ভেবে দেখুন! তাওহীদ কিভাবে স্বভাবের মধ্যেই নিহিত থাকে। আর শিরক হল একটি আকস্মিক বিষয়, যা মানুষই উদ্ভাবন করে এবং তার দিকে ধাবিত হয়। উল্লেখিত ব্যক্তির নিকট কোন রাসুলের আগমন ঘটেনি, তা সত্ত্বেও তিনি তাওহীদ বুঝেছেন এবং তার দাবি পূর্ণ করেছেন। তাই তিনি নাজাত পেয়েছেন। কিন্তু শরীয়তের অন্যান্য বিষয় ও ইবাদাত যা রাসুলের মাধ্যম ছাড়া বুঝা সম্ভব না সে বিষয়ে অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে।
যেমন ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। তিনি বলতেনঃ

اللهم لو اعلم احب الوجوه إليك لعبدتك به ولكني لا أعلمه ثم يسجد على الارض

براحته (فتح الباري لابن حجر (٢١/ ٢١٨)

অর্থঃ 'হে আল্লাহ আমি যদি তোমার ইবাদতের অন্য কোন উত্তম নিয়ম জানতাম তাহলে আমি সেভাবেই তোমার ইবাদাত করতাম, কিন্তু আমি তা জানি না'। অতঃপর ইতমিনানের সাথে জমিনে সিজদা করতেন। [ফাতহুল বারী লি ইবনে হাজারঃ ২১/২১৮]
সুতরাং তিনি সালাত সিয়াম এধরণের শর'য়ী বিষয় যেগুলোকে রাসূলের মাধ্যম ছাড়া বুঝা সম্ভব নয় সেগুলোর ব্যাপারে অক্ষম বলে গণ্য হবেন। কিন্তু সে সময়কার অন্যান্য লোকেরা অক্ষম সাব্যস্ত হবে না। (এক সহীহ হাদীস অনুযায়ী নবীজির পিতাও) কেননা তারা তাওহীদের মৌলিক দাবি পূরণ করেনি। শিরক কুফর থেকে বেঁচে থাকেনি। (তাদের নিকট কোন ভীতি প্রদর্শনকারী না আসা সত্ত্বেও) যেমন আল্লাহ (সুবঃ) বলেনঃ

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ

অর্থ: 'যাতে তুমি এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আসেনি'। [সূরা কাসাস: ৪৬]

বিষয়টি ভালভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন: কেননা এই বিষয়ে কেউ যদি কিছু নস (আয়াত ও হাদীস) গ্রহণ করে অপর কিছু নস ছেড়ে দেয় তাহলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারবে না এবং বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবে না।

আর এটাও জেনে রাখা প্রয়োজন, এই সমস্ত শাসক ও তাদের সাহায্যকারীদের কুফরী এ কারণে নয় যে, তারা রিসালাতের প্রমাণ সম্পর্কে অজ্ঞ। বরং তাদের নিকট পাঠানো হয়েছে সর্বশেষ রাসূল যার পর আর কোন রাসূল আসবেন না। আর তাদের কাছে আছে কিতাবুল্লাহ যার মধ্যে তাওহীদের বিষয়গুলো বিদ্যমান। যাতে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়। তারা সত্যের অনুসন্ধান ও অনুসরণে বিমুখ। তাদের কুফরীও বিমুখতার কারণে। রিসালাতের প্রমাণ না পৌছার কারণে নয়।

খৃষ্টানরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পাদ্রী ও সন্যাসীদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে। তাদের জানা ছিলনা বিধান প্রদানের ক্ষেত্রে গাইরুল্লাহর অনুসরণ তাদের ইবাদত ও শিরক। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আদি বিন হাতিমের হাদীসে।[১২] তিনি বলেছিলেন: إنهم لم يكونوا يعبدونهم "তারাতো (খৃষ্টানরা) তাদের (পাদ্রীদের) ইবাদাত করত না"।

তার এ উক্তি দ্বারা বুঝা যায় তাদের জানা ছিল না হালাল হারাম ও বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কথা গ্রহণ করা ইবাদতেরই অন্তর্ভূক্ত। তথাপি তারা এই ক্ষমতা গাইরুল্লাহ কে প্রদানের কারণে কাফের হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহ (সুবঃ) এই সমস্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে বলেছেন:

---

[১২] সূরা তাওবার ৩১নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাছীর উল্লেখ করেন: ইমাম আহমদ, তিরমিযী, ইবনে জারীর বিভিন্ন সূত্রে আদী ইবনে হাতেম থেকে বর্ণনা করেন, যখন তার নিকট রাসুল (সা:) এর দাওয়াত পৌছল। .... অতঃপর তিনি রাসূল (সা:) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন আর তার গলায় রূপার ক্রুশ ঝুলানো ছিল। রাসূল (সা:) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন: 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে' তখন তিনি বললেন: তারাতো তাদের ইবাদত করতো না। রাসূল (সা:) বললেন: তারা হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করত আর এরা তাদের অনুসরন করত। এটাই হলো তাদের ইবাদত। (সুনান আত তিরমিযী:৩০৯৫; সনদ:সহীহ)

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

অর্থ: 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে'। [সূরা তাওবা: ৩১]

আর তাদেরকে এই অজ্ঞতার কারণে ক্ষমা করা হয়নি। কেননা বিষয়টি আল্লাহ প্রদত্ত স্বভাবের বিপরীত। যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, রিযিক প্রদান করছেন, আকৃতি দিয়েছেন, সুস্থ রেখেছেন। সুতরাং কোন ভাবেই সম্ভব না তিনি ব্যতীত অন্য কেউ বিধান দিবে, আইন প্রণয়ন করবে তার হালালকৃত জিনিসকে হারাম, আর হারামকৃত জিনিসকে হালাল সাব্যস্ত করবে।

সুতরাং এ অজুহাত কি কোন ভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে কেননা এই শাসক, সামরিক কর্মকর্তা, পুলিশ, সাংবাদিক, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদেরকে এবং অন্যান্যদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমাদের ধর্ম কী? তারা বলবে ইসলাম, এবং আসমানি কিতাব হলো আল-কুরআন। তাদের অনেকেতো কুরআনও তেলাওয়াত করে। তাহলে কি একথা বলা যাবে যে, তারা অজ্ঞ, তাদের নিকট এখনো প্রমাণ পৌছেনি? অধিকন্তু তারা ইসলাম ও কুরআনকে অবমাননা করে। যে ব্যক্তি কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। মামলা দায়ের করে এবং তাকে কারাগারে বন্দি করে।

আর যে ব্যক্তি তাওহীদের দিকে আহ্বান করে; শিরক কুফর পরিত্যাগের দিকে আহবান করে; এ সকল তাগুতদের সমর্থকেরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। অন্য দিকে তারা তাগুতের বিধান এবং স্বরচিত আইন ও শিরকী প্রথাকে সাহায্য করে। তারা শর'য়ী বিধানকে অনুপযুক্ত মনে করে এবং একনিষ্ট মুসলিমদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। তাদেরকে সহযোগিতা করে। আর এটা আল্লাহর দ্বীনের সম্পূর্ণ বিপরীত তা কোন মুসলমানের বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

এটা কি এমন কোন সূক্ষ্ম বা জটিল বিষয় যে, বলতে হবে তাদের নিকট তো এখনো প্রমাণ পৌছেনি? না! কোন ভাবেই না। আল্লাহর শপথ! বিষয়টি দ্বী-প্রহরের সূর্য্যের চেয়েও স্পষ্ট।

দুটি দলের মাঝে দন্দ্ব। একটি হল শিরকের অপরটি তাওহীদের। একটি পবিত্র শরীয়ার অপরটি মানব রচিত অপবিত্র বিধানের। আর এই লোকেরা হয়তো ভালবাসার টানে অথবা আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে স্ব-ইচ্ছায়, স্ব-জ্ঞানে তাগুতদের কাতারে শামিল হয়েছে। তাই সে পথেই যুদ্ধ করে ও তাদেরকেই সাহায্য করে। আর মুওয়াহ্হিদদের কেউ যদি তাদের এই পথ ও মতকে অস্বীকার করে তাহলে তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি ব্যয় করে।

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

অর্থ: 'যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে'। [সূরা নিসা: ৭৬]

অচিরেই কিয়ামতের দিন যখন এরা মুসলমানদের সফলতা ও তাগুতপন্থীদের ধ্বংস দেখতে পাবে তখন বলতে থাকবে:

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (٦٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

অর্থ: 'হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও বিশিষ্ট লোকদের আনুগত্য করেছিলাম, তখন তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রব, আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দিন এবং তাদেরকে অভিশপ্ত বানান ঘোর অভিশপ্ত'।[সূরা আহযাব: ৬৭, ৬৮]

তাদের এই উক্তিটি ভেবে দেখুন: فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا "তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে" কিন্তু নেতারা তাদের পথভ্রষ্ট করা সত্ত্বেও তাদের অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না।

আল্লাহ (সুবঃ) কাফেরদের ব্যাপারে অনেক আয়াতে বলেছেন:

এক وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.

অর্থ: 'অথচ তারা মনে করে, তারা খুবই ভাল কাজ করছে'। [সূরা কাহাফ: ১০৪]

দুই وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ.

অর্থ: 'তারা মনে করে, তারা সঠিক পথেই আছে'। [সূরা যুখরুফ: ৩৭]

তিন. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ

অর্থ:'তারা মনে করে যে, তারা কোন কিছুর উপর আছে'। [সূরা আল-মুজাদালা: ১৮]

কিন্তু তাদের শিরক ও কুফর সম্পর্কে সু-ধারণা এবং তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞতার অজুহাত কোন কাজে আসবে না। কেননা তারা ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়কে আদায় করেনি। যার জন্য আল্লাহ অনেক প্রমাণ পেশ করেছেন, সকল রাসূলকে প্রেরণ করেছেন।

তবে যদি তাদের ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা কোন সংশয়পূর্ণ জটিল বিষয়ে হত আর তাদের নিকট ইসলামের প্রধান উৎসগুলো (কুরআন, হাদীস ইত্যাদি) বিদ্যমান না থাকতো তাহলে তাদের অজুহাত গ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্ভবনা ছিল।

ষষ্ঠ সংশয়:

তারা তো বাধ্য, দরিদ্র ও অসহায়।

তারা বলে: এই সৈনিকদের অনেকেই তাগুতকে ভালবাসে না, বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে এবং তাদের রচিত বিধান থেকে পৃথক থাকে। তাদের অন্তরে রয়েছে ওদের প্রতি বিদ্বেষ। কিন্তু তারা বেতন ও ভাতার কারণে অক্ষম। আর কারো কারো অবসর গ্রহনের অল্প কয়েক বছর অবশিষ্ট আছে। তারা তাদের দূর্বলতার কথা প্রকাশ করে। তাদের কতকের কাজে তো ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণ নিহিত।

আমাদের জবাব: আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ্র নিকট ঈমান হল:

الاعتقاد باجنان والقول بالسان والعمل بالجوارح والاركان

অর্থ ঃ অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা, এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গ দ্বারা আমল করা।

ঈমান শুধু মাত্র অন্তর দ্বারা বিশ্বাসের নাম নয়। তাই الكفربالطــاغوت (তাগুতকে অস্বীকার) প্রকাশ্যে ও গোপনে উভয়ভাবে হওয়া আবশ্যক। এজন্য আমরা আমাদের শরিয়তে বাহ্যিক দিকেরই বিবেচনা করি। অদৃশ্য বিষয়ে বাড়াবাড়ি করি না। কেননা অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

অতএব কোন মুনাফিক যদি তার অন্তরে কুফরের প্রতি ভালবাসা ও শরীয়তের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাগুতকে অস্বীকার করে ও ইসলামের বাহ্যিক বিধান সমূহকে আঁকড়ে ধরে। তাহলে আমরা তার বাহ্যিক দিকটাই গ্রহণ করি এবং তাকে মুসলিমদের মাঝে গন্য করি। কেননা অভান্তরীণ বিষয়ে আমাদের সামান্যতম জানার অবকাশ নেই। (যদিও সে মুসলিম খলিফার ভয়ে ইসলাম প্রকাশ করে) এ কারণেই তাকে মুসলিমদের মধ্যে গণ্য করা হয় ও তার জান মাল সংরক্ষণ করা হয়। আর পরকালে তার বিচার আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপরই ন্যাস্ত। মুনাফিকদের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

অর্থ: "নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের অতল গহবরে পতিত হবে।"[সূরা নিসা: ১৪৫]

এমনি ভাবে যে ব্যক্তি অন্তরে আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং তাগুত কে ঘৃণা করে কিন্তু তার বাহ্যিক দিক হয় এর বিপরীত অর্থাৎ মুশরিককে সাহায্য করে, তাগুতের বাহিনীতে যোগ দেয়, তাদের দল ভারী করে, তাদের সংবিধানকে

সংরক্ষণ করে, তাদেরকে সাহায্য করে ও মুওয়াহ্হিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এমতাবস্থায় আমরা বাহ্যিক দিক লক্ষ করে তার ব্যাপারে ফয়সালা দিব। কেননা আমরা তো কারো হৃদয় ও বুক ফাড়ার ব্যাপারে আদিষ্ট নই। আর এ কারণেই উমার (রাঃ) বলেছেনঃ

إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ

“নিশ্চয় রাসূলের (সাঃ) সময় মানুষদেরকে ওহীর মাধ্যমে চেনা হত। আর ওহী তো এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এখন আমরা তোমাদেরকে গ্রহণ করবো তোমাদের কর্ম অনুযায়ী। যে ব্যক্তি আমাদের সামনে ভাল কাজ প্রকাশ করবে আমরা তার প্রতি বিশ্বাস রাখব এবং তাকে নিকটে করে নিব, তার অভ্যান্তরীন বিষয়ে আমাদের কোন দায়ীত্ব নেই। আল্লাহই তার অভ্যন্ত রীন হিসাব নিবেন। আর যে ব্যক্তি আমাদের সামনে মন্দ বিষয় প্রকাশ করবে আমরা তার প্রতি বিশ্বাস রাখব না এবং তাকে সত্যায়ন করব না যদিও সে বলে তার অভ্যন্তর সুন্দর।” [সহীহুল বুখারীঃ ২৬৪১]

বুখারীর একটি ঘটনাও এর উপর প্রমাণ বহন করে। যাতে বলা হয়ছেঃ “কিছু লোক কা'বায় আক্রমণ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে ধসিয়ে দিবেন। অথচ তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও থাকবে, যে বাধ্য হয়ে তাদের সাথে বের হবে। কেননা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন রাসূল (সাঃ) কে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যারা বাধ্য হয়ে তাদের সাথে বের হবে। মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তাদের উদ্দেশ্য হবেনা। উত্তরে রাসূল (সাঃ) তাকে বলেছিলেনঃ

يهلكون مهلكًا واحدًا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم

“তারা একই সাথে ধ্বংস হবে। (কিয়ামতের দিন) বিভিন্ন স্থান থেকে তারা উঠবে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের নিয়্যাত অনুযায়ী উঠাবেন।” [সহীহ মুসলিমঃ কিতাবুল ফিতান ওয়া আসরাতুস সাআ: ৮-(২৮৮৪)]

এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহঃ) যে সমস্ত ব্যক্তি তাতারীদের সংবিধান “ইয়াসিক” এর অনুসরণ করেছিল তাদের ব্যাপারে কুফুরীর ফাতোয়া দিয়েছিলেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা ঐ

বাহিনীকে হারাম শরীফ ও বাইতুল্লাহর অসম্মান করার দরুন ধসিয়ে দিবেন। অথচ তাদের মধ্যে কেউ কেউ সালাত আদায় করত, সিয়াম পালন করত, কিন্তু তারা এসেছিল বাধ্য হয়ে। তথাপিও আল্লাহ (সুবঃ) তাদের মাঝে পার্থক্য করবেননা। আর কিয়ামাতের দিন তাদের ফয়সালা হবে নিজ নিজ নিয়ত অনুযায়ী। তাহলে কারা বাধ্য আর কারা বাধ্য নয়, এই পার্থক্য করা কিভাবে মুজাহিদগণের উপর আবশ্যক হতে পারে? অথচ প্রকৃত অবস্থা তাদের জানা নেই।

আব্বাস (রাঃ) যখন বদরের যুদ্ধে কাফেরদের কাতারে আত্মগোপন করেন তখন তার সাথে রাসূল (সাঃ) এর আচরণ 'বাধ্যতা অজুহাত নয়' এর উপর প্রমাণ বহন করে। রাসূল (সাঃ) ধারণা করেছিলেন, তিনি হয়ত মনে মনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর বাধ্য হয়ে কাফেরদের সাথে এসেছেন তাই তাকে রাসূল (সাঃ) সম্বোধন করে বললেন, "আপনার অন্তরের বিষয় আল্লাহর দিকে ন্যস্ত, আর আমাদের কাছে ধর্তব্য হল আপনার বাহ্যিক দিক।"[১৩]

মূল ঘটনাটি বুখারীর ২৫৩৭ ও ৩০৪৮ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে একথাও উল্লেখ আছে, রাসূল (সাঃ) তাকে মুশরিকদের ন্যায় ফিদিয়া দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার আদেশ দেন। সুতরাং রাসূল (সাঃ) তার সাথে সেই আচরণই করেছেন যা তিনি অন্যান্য মুশরিকদের সাথে করেছেন। আমরাও তো এই একই আচরণ আল্লাহর সাথে শিরককারী ও মানব রচিত আইনের সাহায্যকারী সৈনিকদের সাথে করে থাকি।

রাসূল (সাঃ) কাউকে তাকফীর (কাফের সাবস্ত) করা এবং কারো উপর কোন হুকুম প্রদান করা ও অন্যসব ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে বেশী আল্লাহভীরু মুত্তাকী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের বাহ্যিক দিক গ্রহণ করেছেন। তাহলে আমরা কেন তা করব না?

বাধ্য হয়ে কুফর প্রকাশের ব্যাপারে, উলামায়ে কেরাম সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তারা কিছুতেই ঐ সীমার আওতাভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি তাদের অবস্থা অবলোকন করেছে, সে কোন ভাবেই তাদের কে বাধ্য ভাবতে পারে না। কেননা এরা তো কর্ম ও চাকরি নিয়ে গর্ব করে এবং এর পারিশ্রমিক ও বেতন গ্রহণ করে, তাহলে এটা কি ধরণের বাধ্যতা যে, তাদের কে বিনিময় দেয়া হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে আর বছরের পর বছর ধরে শিরকের সাহায্য করে আসছে।

---

[১৩] ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত। (বিঃদ্রঃ আমাদের ক্ষুদ্র তালাশে হাদীসটি লেখকের বর্ণিত শব্দে পাইনি। তবে কিছুটা ভিন্ন শব্দে "বুস্তানুল আহবার মুখতাসারুন্ন নাইলিল আওতার" নামক গ্রন্থে পাওয়া গেছে।)

তাদের পূর্বেও একটি দল ওজর পেশ করেছে কিন্তু তাদের ওজর গ্রহণযোগ্য হয়নি। তারা ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু মুশরিকদের কাতার ছেড়ে (মাদীনায় হিজরাতের মাধ্যমে) মুওয়াহ্হিদদের কাতারে শামীল হয়নি।

অতপর যখন বদরের দিন এল। মুশরিকরা তাদের যুদ্ধের প্রথম কাতারে আসতে বাধ্য করল। একটু ভেবে দেখুন তাদের অবস্থা কী ছিল? তারা তাদের সাথে সেচ্ছায় বের হয়নি। তাদের সেনাবাহিনীতে আগ্রহ নিয়ে ভর্তি হয়নি, যে তারা তাদেরকে বেতন ভাতা দিবে এটা সত্তেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বাধ্য হয়ে যুদ্ধে আসার অজুহাতকে গ্রাহ্য না করে স্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ

অর্থ: "নিশ্চয় যারা নিজদের প্রতি যুলমকারী, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে'? [সূরা নিসা: ৯৭]

অর্থাৎ তোমরা কাদের কাতারে ছিলে? তাওহীদ ও শরীয়তের না শিরক ও কুফুরের? এর সত্য জবাব হল আমরা ছিলাম মুশরিকদের কাতারে। কিন্তু তারা যখন স্বচক্ষে মুশরিকদের ধ্বংস দেখতে পাবে তখন এই জবাব দিতে সাহস করবে না। বরং দূর্বলতা ও অক্ষমতার অজুহাত পেশ করবে। এই ধারণায় যে, এই অজুহাত তাদেরকে শিরক ও মুশরিক থেকে পৃথক করবে। ভেবে দেখুন তারা তাগুত থেকে নিজেদেরকে পৃথক করার কত চেষ্টাই করবে, এটা তাদের কোন উপকারেই আসবে না। কেননা তারাতো তাগুতের কাতারেই মৃত্যুবরণ করেছে। দুনিয়ায় তাদের থেকে পৃথক হয়নি। দেখুন তারা ফেরেস্তাদেরকে কী জবাব দেবে?

قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ

অর্থ ঃ "ফেরেস্তারা বলবে তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলবে দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম।"[সূরা নিসা :৯৭]

হুবহু এই বাক্যটি বর্তমান সময়ের শাসকদের সৈনিক, সাংবাদিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে ।

أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ "তারা কি একে অন্যকে এ বিষয়ে ওসিয়াত করেছে? বরং এরা সীমালংঘনকারী কওম।"[সূরা যারিয়াত: ৫৩]

আর যখন আমরা তাদেরকে তাওহীদের দিকে আহবান করি, শিরক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলি তখন তারা আমাদেরকে এই জবাবই প্রদান করে। আর আল্লাহর দ্বীনে এ সমস্ত লোকদের বিধান যদি আমরা বর্ণনা করি তখন তাদের পক্ষে একদল লোক দাড়িয়ে যায় এবং বলতে থাকে তারাতো দূর্বল,

তাদের এই জবাব কি গ্রহণযোগ্য হবে। এবার ফেরেস্তাদের জবাব ও তাদের পরিণতির কথা শুনুন:

قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

অর্থ: "ফেরেশতারা বলে, 'আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে'? সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।"[সূরা নিসা: ৯৭]

তাদের কী অন্য কোন রিযিকের ব্যবস্থা ছিল না যে তারা শিরক ছেড়ে সে রাস্তা গ্রহণ করবে। যে মহান রিযিকদাতা পিঁপড়া, মৌমাছি, পাখ-পাখালী, চতুষ্পদ জন্তু এবং কাফের মুশরিকদের কে রিযিক প্রদান করেন। তিনি বুঝি আল্লাহভীরু শিরক থেকে মুক্ত তাওহীদে বিশ্বাসীদের রিযিক প্রদান করবেন না? (তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে)

তারা স্বেচ্ছায় কাফেরদের সঙ্গ না দেয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কত বড় ধমকি দিলেন। কিন্তু এর পরে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيل

فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا

অর্থ: "তবে যে দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন রাস্তা খুঁজে পায় না। অতঃপর আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।" [সূরা নিসা: ৯৮, ৯৯]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির অক্ষমতার অজুহাত গ্রহণ করবেন যে কাফেরদেরকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর দিকে গমনের কোন সুযোগ না পায় যেমন সে আহত, বন্দি অথবা চলতে অক্ষম, অথবা যে ব্যক্তি হিজরত করে মুসলিমদের কাতারে মিলিত হওয়ার কোন পথ না পায়, যেমন মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, বা দূর্বল।

অতপর আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে এই মুশরিকদের থেকে হিজরত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং তাদের জন্যে উত্তম ও যথেষ্ট পরিমান রিযিকের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন:

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً

অর্থ: "আর যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে, সে জমিনে বহু আশ্রয়ের জায়গা ও সচ্ছলতা পাবে।"[সূরা নিসা: ১০০]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা শিরক ও মুশরিকদের বর্জনের প্রতি আহবান করে বলেছেন:

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অর্থঃ "আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুনায় তোমাদের অভাবমুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"[সূরা তাওবা: ২৮]

অপর কিছু লোক তাদের এই বিক্রিত কাজকে 'মাসলাহাত' (কল্যাণ, কৌশল) এর দোহাই দিয়ে বৈধ করতে চায়, তারা দাবী করে তাদের এই পঁচা দূর্গন্ধযুক্ত বেতন দ্বারা দ্বীনের খেদমাত করে। বাস্তব অবস্থা হল তারা পেট ও পকেটের গোলাম।

সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) তার সাথীদেরকে উপদেশ দিতেন তারা যেন বাদশাদের সাক্ষাৎ এবং তাদের তোষামোদ থেকে বিরত থাকে। অথচ ঐ সমস্ত বাদশারা শরয়ী বিধান অনুযায়ী বিচার পরিচালনা করত। যদিও তাদের থেকে কিছু কিছু গোনাহ প্রকাশ পেত। তাহলে বর্তমানের কুফুর ও শিরককারী শাসকদের অবস্থা কিরুপ হবে?

একবার তিনি তার এক ছাত্র কে উপদেশ দিলেন:- তুমি শাসকদের নিকটবর্তী হওয়া থেকে অথবা যে কোন বিষয়ে তাদের সাথে মেলামেশা করা থেকে সাবধান থাকবে এবং তুমি প্রতারণায় পড়া থেকে সাবধান থকবে। হয়ত তোমাকে বলা হবে (তুমি শাসকদের সাথে সম্পর্ক রাখ) যাতে তাদের নিকট সুপারিশ করতে পার অথবা মাজলুমদের রক্ষা ও তাদের থেকে জুলুম প্রতিহত করতে সক্ষম হও। কেননা এগুলো হল ইবলিসের ধোঁকা। জ্ঞানপাপীরা এগুলোকে অজুহাত হিসাবে গ্রহণ করেছে।

আর সত্যই তারা যে জিনিস কে দাওয়াতের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছে তা শয়তানের ধোকা ছাড়া অন্য কিছুই না। কেননা তারা এর দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ 'মাসলাহাত' তাওহীদকে ধ্বংস করছে এবং সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করছে।

সায়্যেদ কুতুব (রহ:) ঠিকই বলেছেন:- এই শাসকরা অনেক দাঈ'দের পদস্খলনের কারণ হয়েছে এবং মূর্তি সেজে বসে আছে ফলে এই দাঈ ব্যক্তি আল্লাহ কে ব্যতিরেকে তাদের উপাসনা করছে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) কে একবার আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের একজন শায়েখের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল "এক ব্যক্তি এক ডাকাত দলের খবর জানতে পারল, যারা সবসময় কবীরা গুনাহে লিপ্ত থাকে। ডাকাতি, হত্যা ও অন্যান্য অশ্লীল কাজ কর্ম করে। তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শনের ইচ্ছা করলেন, কিন্তু তার নিকট শুধু একটি পন্থা উপযোগী মনে হল। তিনি তাদের জন্য দুফ ও গায়কের ব্যবস্থা করলেন, যারা

দুফ বাজাবে এবং অশস্লীল নয় এমন গান গাবে। ফলে দেখা গেল তাদের কিছু মানুষ হেদায়াত পেল এবং যারা পূর্বে কবীরাহ গুনাহে লিপ্ত থাকত তারা সগীরা গুনাহ ও সন্দেহ যুক্ত কাজ থেকে বিরত থাকতে শুরু করল। শায়েখের এই কাজ কি বৈধ?

ইবনে তাইমিয়্যা (রহঃ) জবাবের সারমর্ম হলঃ এই পদ্ধতিটি "বেদআত" কেননা রাসূল (সাঃ) এর শরীয়াত অনুযায়ী গান হল শয়তানের পদ্ধতি। কেননা এর ফলাফল যদিও বাহ্যিক ভাবে ভাল, কিন্তু এর পরিণাম শুভ নয়। কেননা নাপাক দ্বারা যেমনি ভাবে নাপাক দূর হয়না। ঠিক তেমনি ভাবে পেশাবের দ্বারা পেশাবও পবিত্র হয় না। যেমনি ভাবে একজন দাঈ'র উদ্দেশ্য মহান ও পবিত্র তাই তার দাওয়াতের মাধ্যমও সর্বোত্তম হওয়া চাই।

জেনে রাখা ভালোঃ জগতের সবচেয়ে বড় 'মাসলাহাত' হল তাওহীদ, আর সবচেয়ে বড় অনিষ্ট হল শিরক। সুতরাং আর যত কল্যাণ তাওহীদের বিপরীতে আসবে সব প্রত্যাক্ষাত। আর শিরকের অনিষ্টতার সামনে অন্য সকল অনিষ্টতা মূল্যহীন। যে ব্যক্তি তাওহীদের মহত্ব ও শিরকের ভয়াবহতা বুঝেছে তার জন্য সম্ভবপর নয় যে, সে তাওহীদ ধ্বংসের কারণ হবে এবং শিরকের পাহারাদার হবে। আর তাওহীদের ক্ষেত্রে অন্য কোন 'মাসলাহাত' আর শিরকের ক্ষেত্রে অন্য কোন অনিষ্টতার অজুহাত পেশ করবে এবং তার জন্য এটাও সম্ভবর নয় যে, সে দ্বীনকে এমন ছাগলের ন্যায় বানাবে যাকে অন্যের কল্যাণে জবেহ করা হয়।

সপ্তম সংশয়:

তাদেরকে তাকফীর করে কী লাভ?

তারা বলেঃ এই সৈনিক, সাংবাদিক ও তাগুতের অন্যান্য সাহায্যকারী কে তাকফীর করে কী লাভ?

আমাদের জবাবঃ এটা আল্লাহ (সুবঃ) এর বিধান। তাই কারণ ও উপকারিতা জানার চেয়ে বেশী প্রয়োজন, এই বিধান মেনে নেয়া।

তাকফীরের প্রয়োজনীয়তা অনেক। এই ছোট পরিসরে সব লেখা সম্ভব নয়। তাই এখানে বিশেষ কয়েকটি তুলে ধরা হলোঃ

এক. তাওহীদের একটি মৌলিক দাবি হল কাফের-মুশরিকদের সাথে এবং তাদের উপাস্যদের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতা এবং সম্পর্কচ্ছেদ করা। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

অর্থ:- 'ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হল আমাদের এবং তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন' ।[সূরা মুমতাহিনা: ৪]

বুঝা গেল আল্লাহ (সুবঃ) আমাদেরকে এই উত্তম আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ মিল্লাতের অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছেন। যার একটি অত্যাবশ্যক দিক হল, মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং তাদের সাথে শত্রুতা ঘোষণা করা। যে ব্যক্তি মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না; সে কিভাবে এই বিধান পালন করবে? কার সাথে কিভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করবে? আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

অর্থ:- "বল, হে কাফিররা, তোমরা যার ইবাদাত কর আমি তার ইবাদাত করি না। এবং আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী নও। আর তোমরা যার ইবাদাত করছ আমি তার ইবাদাতকারী হব না। আর আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী হবে না। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।"[সূরা কাফিরুন: ১-৬]

<u>দুই. ভাল-মন্দ পার্থক্যে সমর্থ হওয়া এবং ভ্রান্ত পথ চিহ্নিত করতে সক্ষম হওয়া।</u> আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ

অর্থ: "আর এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি। আর যাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়।" [সূরা আনআম: ৫৫]

যে ব্যক্তি ইসলামকে কুফর থেকে এবং মুসলিমকে কাফের থেকে পৃথক করতে পারবে না সে কিভাবে কাফেরদের পথ চিনতে পারবে? মুমিনদের পথ

আকড়ে ধরবে? আল্লাহর জন্য ভলবাসা (মুমিনদের সাথে) এবং আল্লাহর জন্য দুশমনি (কাফেরদের সাথে) রাখবে? অথচ এটা ঈমানের প্রধান শর্ত, মুমিনের প্রথম কাজ। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

অর্থ: 'আর যারা কুফরী করে, তারা একে অপরের বন্ধু। যদি তোমরা তা না কর, {মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব ও কাফেরদের সাথে শত্রুতা। (আইসারুত্ তাফাসীর)} তাহলে জমিনে ফিতনা ও বড় ফাসাদ হবে'। [সূরা আনফাল: ৭৩]

এই ভালবাসা ও শত্রুতা বুঝা যাবে যদি কাজ-কর্মে তার আলামত ও চিহ্ন প্রকাশ পায়। আর যে এই দুই দলের মাঝে পার্থক্যই করবে না, সে কিভাবে এই রুকন পালন করবে?

বাস্তবতা হল এর মূল প্রমাণ। যে ব্যক্তি তাকফীর তথা কাফের ও মুসলমানদের মাঝে পার্থক্য করাকে অবহেলা ও তুচ্ছ ভাবে, সে জানেনা কাকে ভালবাসবে ও কার সাথে শত্রুতা রাখবে? আপনি দেখতে পাবেন এসব অজ্ঞ লোকেরা অধিকাংশ সময় মুসলিম ও কাফেরদের সাথে এক আচরণ করে। অথচ আল্লাহ (সুব;) বলেন:

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

অর্থ: 'তবে কি আমি মুসলিমদেরকে অবাধ্যদের মতই গণ্য করব? তোমাদের কী হল, তোমরা কিভাবে ফয়সালা করছ?'[সূরা আল কলাম: ৩৫, ৩৬]

অপর স্থানে বলেছেন:

أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

অর্থ: 'নাকি আমি মুত্তাকীদেরকে পাপাচারীদের সমতুল্য গণ্য করব? [সূরা সোয়াদ: ২৮]

তিন. আর যদি মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে পার্থক্য করা না হয় তাহলে যে সমস্ত বিধি-বিধান এর উপর ভিত্তি করে আবশ্যক করা হয়েছে, সেগুলো কিভাবে পালন করা সম্ভব হবে?

যেমন: মিরাছ প্রদান, বৈবাহিক বন্ধন, যবেহকৃত প্রাণী ভক্ষণ, সালাম প্রদান সহ অন্যান্য আচার-আচরণ। এ ধরণের অনেক হুকুম যেগুলো শুধুমাত্র মুসলমানদের মাঝে সীমাবদ্ধ। কাফেরদের সাথে বৈধ নয়। এ কারণে আপনি কাফের ও মুশরিকদের সাথে মুওয়াহ্হিদদের আচরণ এবং যারা উক্ত বিষয়টি

বুঝেনা বরং অনর্থকভাবে, তাদের আচরণের মাঝে বিশাল ব্যবধান লক্ষ্য করবেন। তারা মূলত এ কারণেই এক আল্লাহয় বিশ্বাসীদের কে ঘৃণা করে এবং তাদের থেকে দূরে থাকে। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো মুওয়াহ্হিদদের কে তাকফীর করে।

কারণ, মুওয়াহ্হিদরা নামধারি মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আর এরা মুওয়াহ্হিদদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে, শত্রুতা করে, তাদের দাওয়াহ কে ভর্ৎসনা করে।

এরা তাওহীদ ও জাতীয়তাবাদের মাঝে পার্থক্য করে না। অথচ তাওহীদ মুসলিম ও কাফেরদের মাঝে পার্থক্য ও ব্যবধান সৃষ্টি করে, আর জাতীয়তাবাদ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে এক করে।

ফেরেস্তারা রাসূল (সাঃ) এর যে গুন বর্ণনা করেছিলেন এরা সে সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা অজ্ঞতার ভান করে। ফেরেস্তারা বলেছিলেন:

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ (صحيح البخاري)

অর্থ: "মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষদেরকে ভাগ করে দিয়েছেন (মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে)"। [সহীহ্ বুখারী: ৭২৮১]

আর তারা কুরআনকেও প্রত্যাখ্যান করছে। কেননা কুরআন মুশরিক ও মুমিনদের মাঝে পার্থক্য করেছে। যদিও তারা বংশগতভাবে এক হয়।

চার. মুসলমান ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য জানা থাকলে সঠিক দাওয়াতের পদ্ধতি বুঝে আসে।

মুসলমানের দায়িত্ব হলো সে যেখানেই থাকুক সেখানে দাওয়াতের কাজ করবে। মুসলমান, মুশরিক, আহলে কিতাব ও মুরতাদ সকলকে দাওয়াতের পদ্ধতি এক নয়। বরং দাওয়াতের জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি। তাই কেউ যদি মুসলিম ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য করতে না পারে তাহলে সে দাওয়াত দিবে কিভাবে? রাসূল (সাঃ) মুওয়ায (রাযিঃ) ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বলেছিলেন:

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ [صحيح البخاري]

অর্থ: “তুমি খৃষ্টানদের একটি সম্প্রদায়ের নিকট গমন করছ। সর্বপ্রথম তুমি তাদেরকে আল্লাহর এককত্বের দিকে আহ্বান করবে। যদি তারা আল্লাহর এককত্বকে মেনে নেয় তাহলে তুমি তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ (সুবঃ) তাদের উপর দৈনিক পাঁচবার সালাত ফরয করেছেন। [সহীহ বুখারী: ৭৩৭২]
লক্ষ্য করুন! প্রথমে রাসূল (সাঃ) মু'আজ (রাযিঃ) কে সে সম্প্রদায়ের অবস্থা অবহিত করলেন। তারপর শিখিয়ে দিলেন তাদের সাথে কিভাবে আচরণ করবে এবং কিভাবে তাদেরকে দাওয়াত দিবে।

শেষ কথা

যে সমস্ত ব্যক্তিরা আমাদের নামে অপবাদ রটায় যে, আমরা সকলকে ঢালাও ভাবে কাফের বলি। তারা যেন আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে। অথচ তারা আমাদের আলোচনাও শোনেনা। আমাদের লেখা বই গুলোও পড়ে না। একদিন তাদের সেই মহান রবের সামনে দাঁড়াতে হবে যার নিকট কোন কিছু গোপন নেই। এবং তাদের বলা কথাগুলো এমন এক কিতাবে সংরক্ষিত যাতে ছোট বড় কোন কিছুই ছাড়া হয় না। আল্লাহ (সুবঃ) বলেন:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

অর্থ: “আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোন অন্যায় ছাড়াই কষ্ট দেয়, নিশ্চয় তারা বহন করবে অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ।”[সূরা আহযাব: ৫৮]
রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

অর্থ: “যে ব্যক্তি কোন মুমিনের ব্যাপারে এমন কথা বলে যা তার মাঝে নেই। আল্লাহ (সুবঃ) জাহান্নামের পূজের মাঝে তাকে অবস্থান করাবে যতক্ষণ না সে তার কথা ফিরিয়ে নেয়।” [সুনানে আবু দাউদ: ৩৫৯৯]

আমাদের স্পষ্ট ঘোষণা

আমরা মুসলমানদের এমন গুনাহের কারণে কাফের বলিনা, যার কারণে সে কাফের হয় না। হ্যাঁ! তবে যদি সে এ গুনাহকে হালাল ভাবে সেটা ভিন্ন

কথা। আর আমরা ব্যাপকভাবে সকল মুসলমানকে কাফের বলিনা। যেমনটি আমাদের ব্যাপারে তাগুতরা অপবাদ দেয়। বরং আমরা তাকফীর করি
(১) যে ব্যক্তি তাওহীদে বিশ্বাসী নয়।
(২) যে তাওহীদকে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দিতে সহায়তা করে।
(৩) যার মধ্যে তাওহীদ নষ্টকারী কোন জিনিস বিদ্যমান থাকে।
(৪) যারা মুওয়াহ্হিদদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করে।
(৫) এবং যারা দ্বীনের কারণে মুওয়াহ্হিদদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে।
আমাদের জানা আছে কুফরের জন্য অনেক শর্ত ও মাওআ'নেয় (তাকফীরকে প্রতিহতকারী কারণ সমূহ) রয়েছে। তাই আমরা শর্ত পাওয়া ব্যতীত অথবা মাওআ'নেয় থেকে কোন একটি বিদ্যমান থাকাবস্থায় কাউকে তাকফীর করি না।
কেননা আমরা জানি কোন ব্যক্তি থেকে যদি কুফরীমূলক কোন কথা বা কাজ প্রকাশ পায় তথাপি তার মধ্যে যদি কোন একটি মানেয়ে কুফর (কুফর প্রতিহতকারী কারণ) থাকে তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে না।

আমরা উল্লেখিত অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করেছি। ঐ লোকদের ব্যাপারে যারা তাওহীদের শত্রু আর শিরকের বন্ধু, যারা ধর্ম পরিত্যাগ করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। মানব রচিত আইনকে সাহায্য করছে। আর এদের কুফরী তো দিবালোকের সূর্য্যের চেয়েও স্পষ্ট। তাই আমাদের তাকফীর প্রবৃত্তির তাড়না, তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) বা অন্য কোন কারণে নয়। বরং শরয়ী স্পষ্ট প্রমাণের উপর ভিত্তি করে।

আমাদের সর্বশেষ পয়গাম

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর! আল্লাহকে ভয় কর!!
আল্লাহর এ পয়গাম স্বরণ রেখ:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থ: 'আর তোমরা হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-বুঝে হককে গোপন করো না।' [সূরা বাক্বারা: ৪২]
তোমাদের ও আমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ্ বিদ্যমান। আমরা এর বাইরে কোন বিধান গ্রহণ করবো না। সক্ষম হলে তোমরাও কুরআন-হাদীস

থেকে এমন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আস যা আমদের কথাকে ভুল সাব্যস্ত করবে। তাহলে অবশ্যই আমরা তা গ্রহণ করব ও তার উপর আমল করে সৌভাগ্যবান হব। যেমনটি আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন:

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

অর্থ: 'বল, তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'[সূরা নামল: ৬৪]

আর এই শিয়ালের ফাঁকা হুক্কা-হুওয়া এবং চিন্তাপ্রসূত কুধারণা শরয়ী দলিল প্রমাণ হওয়ার অবকাশ রাখেনা। আর কুরআন ও সুন্নাহের সামনে এগুলোর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। আর যে ব্যক্তি শরয়ী প্রমাণ গ্রহণ করবে না এবং তার সামনে নত হবে না যত আলোচনাই করা হোক তার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ (সুবঃ) বলেছেন:

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ

অর্থ: 'অতএব তারা আল্লাহ ও তাঁর আয়াতের পর আর কোন্ কথায় বিশ্বাস করবে?' [সূরা জাছিয়া: ৬]

পরিশেষে ইবনুল কাইয়ূম (র:) এর কুরআন সুন্নাহ সম্পর্কে কয়েকটি চরণ:

من لم يكن يكفيه ذان فلا كفاه الله شرَّ حوادث الأزمان

من لم يكن يشفيه ذان فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان

من لم يكن يغنيه ذان رماه رب العرش بالإقلال والحرمان

إنّ الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأراذل سفلة الحيوان

"কুরআন হাদীস যার জন্য যথেষ্ট নয়, আল্লাহ (সুবঃ) তাকে যমানার নতুন নতুন ফেতনা থেকে রক্ষা করবেন না।"

"কুরআন হাদীস যার জন্য আরোগ্য হবে না, আল্লাহ (সুবঃ) তার শরীর মনে কখনো শেফা দিবেন না।"

"কুরআন হাদীস যার জন্য পর্যাপ্ত হবে না, আল্লাহ (সুবঃ) তাকে সল্পতা ও বঞ্চনার মাঝে নিক্ষেপ করবেন।"

"আর কথা হয় বড়দের সাথে ঐ নিচুদের সাথে নয় যারা হাইওয়ানের চেয়েও নিকৃষ্ট।"

আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দিন, আমীন ।